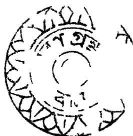
কবির প্রেম

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী।



প্রাপ্তিস্থান :—
ডি, এম্, লাইব্রেরী
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীঅনিল কুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রথম সংস্করণ
দাম :—বারো আনা।

৬৫।২ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট্
ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ.................. .

......................আমার শ্রদ্ধাস্পদ রসসাহিত্যিক "মানে মানে," "শ্যামসুন্দর" প্রভৃতি হাস্যকৌতুক নাটকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত মৃণাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

১৩৪৮ সালের
প্রথম মাসের শুভ
প্রথম দিনে।

স্নেহাস্পদ—
লেখক

বিষয় :—



কবির প্রেম

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

ক্লাব রুম (Club Room)

(নরেন, দুর্ল্লভ, শেখর, অতনু, অমর ও সুধা আসীন)
(কয়েকজন তাস খেলিতেছে, একজন খবরের কাগজ দেখিতেছে, একজন হারমোনিয়াম বাজাইতেছে)

নরেন। ফোর্ ডায়মণ্ডস্

অপর সকলে। নো—নো—নো

দুর্ল্লভ। বাঃ বাঃ—ওরা ত বেশ ক্লাবে এসে ডায়মণ্ডে মেতে উঠল হে ; সুধা ! তুই ভাই একখানা গানের মধ্য দিয়ে আমাদের না হয় একটু আনন্দ দে।

শেখর। হুঁ—ঠিক ধরেছিস্ ! ও গাইবে আমাদের এখানে ! বলে—ওর এখন গানের কত প্রশংসা ! রেডিওর বড় একজন সুগায়ক ; আজই ত সন্ধ্যার সময় ওর গান আছে দেখছিলাম।

অতনু। তা ছাড়া ওর গুরুর মানা—যেখানে সেখানে গাইলে গানের অপমান হবে। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক

কম্পিটিশনে ওর কি সুখ্যাতি ! কত মেডেল, কাপ, শীল্ড—

নরেন। আহাঃ—করলি কি !—বিবি চাল্‌লি কেন ? বিবিটা কি তোকে কামড়াচ্ছিল ? জানিস্ সাহেব এখনো যায়নি—বিবি চাললেই মারা যাবে।

অমর। বিলাতে ছিলাম অনেকদিন কিনা—তাই ভুল হয়ে গেছে। ও দেশে লেডিজ ফার্ষ্ট, কাজেই বিবি আগেই চেলে দিলাম।

বিমল। (খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে) হেয়ার ইউ আর—চালাকি ;—যাদের রাজত্বে সূর্য্য অস্ত যায় না —তাদের সঙ্গে চালাকি !

অতনু। কি হল হে ! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলি যে বিমল।

বিমল। আরে হারতে ত হবেই ! কার সঙ্গে চালাকি ! হুঃ !

নরেন। তার মানে ?—আমার ফোর্ ডায়মণ্ডস্ ডাকা ভুল হয়েছে ?—সবে ত অমরের ভুলে বিবিটা ধরা পড়ে একটা পিঠ আমাদের নষ্ট হয়েছে। এখনও খেলার সব বাকী। এ খেলায় আমাদের Sure game তুই এসে বোস না—আমি Challenge করছি। কি জানিস্ তুই খেলার।

বিমল। আহা হা,—আমি কি তোদের খেলার কথা বলছি। আজ এই কাগজে দিয়েছে যে ৫০ খানা বোমারু বিমান বার্লিনের উপর বেপরোয়াভাবে বোমা বর্ষণ

করে এসেছে। ফলে জার্ম্মানদের মনে বেশ একটা ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। তারা এখন শান্তির প্রস্তাব করছে।

সকলে। আরে আরে তাই বল। (সকলে আবার যে যার কাজে মন দিল)

দুর্ল্লভ। কি হে সুধা! মাঝ থেকে একটা হৈ চৈ হয়ে আমার প্রস্তাবটা কি ভেসে যাবে?

সুধা। কি গাইব বল দুর্ল্লভ দা?

শেখর। আরে ভায়া যা হয় একখানা গাওনা। তবে ভাই রামপ্রসাদী আর কীর্ত্তন বাদ,—আর বাণীগুলো হওয়া চাই হিন্দী নয়—বাংলা।

দুর্ল্লভ। হুকুম করে গান হয় না। যা ওর প্রাণ চাইবে তাই গাইবে। গাওহে গাও—একখানা দরদ দিয়ে গাও।

সুধা। বেশ—যখন তোমরা একান্ত ছাড়বে না,—তখন গাইছি। ভাল যদি না লাগে ত আমি দায়ী নই কিন্তু—

(গীত)

বন্ধু, কইবো কি আর মনের কথা।
নদীর পথে দেখে তারে,—
বাড়লো দ্বিগুণ বুকের ব্যথা।
কেন সে আড়নয়নে দৃষ্টি হেনে
গেল সে মুচকি হেসে আমার পানে
তার চোখের ভাষায় কয়ে গেল
কি জানি কোন গোপন কথা॥

কবির প্রেম

তার রূপ দেখিয়া পাগল হিয়া
মন না মানে মানা।
অঙ্গেতে তার দেখেছিলাম
মিশিয়েছিল চাঁদের কণা ॥
পিঠের পরে এলিয়ে মাথার চুল
কানে ঝুলিয়েছিল বনের দুটী ফুল
তার সে রূপের লাগি হই বিবাগী
ঘুরে বেড়াই যথা তথা।
বন্ধু, কইব কি আর মনের কথা ॥

(গান চলিতেছিল, এমন সময় কবির প্রবেশ)

কবি। বন্ধুগণ, সঙ্গীত কর স্তব্ধ।
সঙ্গীতের এ নহে সময়।
(গান থামিয়া গেল)

সকলে। আরে—আরে কবি যে—এসো—এসো !

কবি। বাঃ ! তোমরা ত সকাল থেকেই বেশ ক্লাব জমিয়ে বসেছ।

নরেন। তা ত বসেছি। কিন্তু তোমার খবর ভাল ত ? বিয়ে করে সত্যিই তুমি বড় morose হয়ে পড়েছ।

কবি। হুঁ, ব্যথা—বড় ব্যথা বন্ধু,—
আর দিয়োনাক খোঁচা—দিয়োনা খোঁচা ;
বিয়ে যা করেছি বৌ নয় ভাই
মস্ত একটী পেঁচা।

অতনু। ও—পেঁচা ;—আচ্ছা তা হ'লে জিজ্ঞাসা করতে হ'লো, —পেঁচাটী লক্ষ্মীপেঁচা, না কালপেঁচা ?

শেখর। লক্ষ্মীপেঁচা নিশ্চয়ই! তা না হলে কি বাছাধনের বিয়ের পর একমাসের মধ্যেই লটারির টাকা মেলে। নিশ্চয়ই লক্ষ্মীপেঁচা বলতে হবে।

কবি। টাকা টাকা—ধন দৌলত কি চেয়েছি আমি ?
আমি চেয়েছিলাম—
"পৃথিবীর এক কোণে বেঁধে ছোট বাসা
ধন নয়, জন নয়, পেতে এতটুকু ভালবাসা।"

নরেন। আহা তোরা থাম্—তোরা বুঝবি না।—মহৎ যারা হয়—তারা ধন দৌলতকে ঘৃণা করে। ওঃ সত্যি কবি—তোমার জন্য ভাই বড় দুঃখ হয়। এরা বুঝবে না তোমার ব্যথা।

কবি। নরেন! নরেন! বড় ব্যথা ভাই, বড় ব্যথা। যা চেয়েছিলাম তা যখন পেলাম না—তখন আর এ জীবনে কি লাভ ভাই ?

নরেন। সত্যি! তা কি করবে এখন ঠিক করেছ ভাই ?

কবি। কি করবো, কি করবো! জীবনের গতি ওলোট পালোট করে দেব—"দেবদাস" হব। জীবনে যা ঘৃণা করতাম তাই হবে—তাই হবে আজ থেকে

আমার কাম্য। তোমরা ত জান—কোন দিন পান খাইনি, বিড়ি খাইনি,—কোন নেশা করিনি।—কিন্তু আজ এই দেখ—(পকেট হইতে এক টিন সিগারেট বাহির করিয়া একটী ধরাইল এবং একটী বোতল বাহির করিল) শিবে চাকরটাকে ব'লে দাও একটা গেলাস দিয়ে যেতে।

সকলে। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—এইত চাই। দাও ত একটা—(একে একে সবাই একটী একটী করিয়া সিগারেট ধরাইল)।

নরেন। এটাতে সত্যি তোমাকে তারিফ্ করতে হলো, কিন্তু আর একটীর কি করলে?—অর্থাৎ কল্পনা সুন্দরীটীকে কি বাজার থেকেই বেছে নিচ্ছ? (এমন সময় শিবে চাকর গেলাস দিয়া গেল)।

কবি। (পান করিতে করিতে) না,—এখনও সেটার কিছু ঠিক করিনি।

নরেন। (কানে কানে) তাহ'লে একটা কথা বলি শোন,—আমার একটী শালী আছে—কলেজে পড়ে—you can try to have a chance—যেমনটী খুঁজছ ঠিক তেমনটীই পাবে। বেশ! তা হলে পরে privateএ কথা কওয়া যাবে'খন। একটা সুবিধা, সে কবিতা আর কবিদের বড় পছন্দ করে।

কবির প্রেম

কবি। আচ্ছা—তাহ'লে আজ বিকেলে তোমাদের বাড়ী যাব'খন।

নরেন। পারত তিন খানা সিনেমার টিকিট কেটে নিয়ে যেও।

কবি। সত্যি!

নরেন। হুঁ।

কবি। আচ্ছা! তাহলে ঠিক!—ঠিক!

অতনু। কবিদা একটা সিগারেট দাও ত! আর হাঁ—কি তোমরা ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছ? তোমার ব্যথার কথা ত আমাদের কিছু বললে না!

কবি। সে বড় দুঃখের কথা ভাই, সে বড় দুঃখের কথা!

শেখর। আহা শুনিই না! বলই না ছাই!

কবি। শুনবে?—তবে শোন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

অতনু। বল।

কবি। বিয়ে করলাম আমি! চোখে দেখলাম না, আলাপ হ'লো না! কোথা থেকে এক পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ধরে এনে বললে—এই তোর বৌ! আমি ত অবাক! না—হ্যাঁ,—কিছুই বলতে পারলাম না। তার ওপর বাবার সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখে আমি গেলাম ভড়কে! অগ্নি সাক্ষী করে বললাম,—ওগো! তুমি আমার স্ত্রী,—সহধর্ম্মিনী,—আমি তোমার স্বামী দেবতা।

অতনু। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য—তারপর?

কবি। তারপর ভাবলাম—যা হবার তাত' হয়ে গেল—না হয় শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। কিছুদিন গেল—একদিন রাত্রে চাঁদের আলোয় বলতে গেলাম :—

" নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী !"

সে করলে কি জান? অপমান করলে—অপমান করলে আমার ভাবকে, আমার ভাষাকে, আমার কবিতাকে! অসহ্য!

শেখর। সত্যি অসহ্য! কি করে অপমান করলে?

কবি। বললে—আমি নাকি তাকে ঠাট্টা করছি, টিট্‌কিরি করছি, সে সুন্দরী নয় বলে।—এই শুনে আমি তার গলা টিপে ধরলাম। সে চীৎকার করে উঠলো। বাবা, মা ছুটে এলেন। কি বলি,—মাথা নীচু করে —এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই সব বললে। মা সব শুনে উল্‌টো বুঝে রেগে আমায় বকাবকি করে গেলেন। বাবা বললেন—আজকালকার শিক্ষার দোষ। মা বাপের পছন্দসই মেয়ে—ছোকরাবাবুদের পছন্দ হয় না। আমায় চোখ রাঙ্গিয়ে বলে গেলেন, ফের্ যদি গায়ে হাত তুলেছ—বাড়ী থেকে দূর করে দেব।

শেখর। তা হলে ত বড় ভয়ানক কথা! তা তিনি কি করলেন?

কবি। হ্যাঁ—সে কথা আর বল কেন ভাই! অদ্ভুত! অদ্ভুত!—সবাই চলে যেতে তিনি এসে আমার পাদুটী ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

অতনু। আরে—কি বললেন তাই বলনা—

কবি। বলবে আর কি,—সেই মামুলী বুলি। ওগো! আমার ভুল হয়েছে—ক্ষমা কর। পায়ে করে লাথি মেরে দিলাম ঠেলে। ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো দশ হাত দূরে। টেবিলের কোন্‌টায় লেগে গেল মাথাটা—কেটে রক্ত পড়তে লাগলো—ভয় হোল—

শেখর। আরে ভয় ত হবেই—হবার ত কথাই—তারপর তুমি কি করলে?

কবি। আমি শুধু বাবার ভয়ে আলমারি থেকে আইওডিন তুলোয় করে লাগিয়ে দিলাম,—রক্ত বন্ধ হলো!

অতনু। আরে রক্ত না হয় বন্ধ হোল। কিন্তু তোমার বাবা মা—তাঁরা যখন জানতে পারলেন?

কবি। বাবা মা জানতে পারবেন বলে ভয় হয়েছিল বটে!—

অতনু। তা হ'লে কি হোল?

কবি। সেই ওটা manage করে নিয়েছিল—বলেছিল জানালার নিচে থেকে কি একটা জিনিব নিয়ে সোজা

হ'তে গিয়ে উপরের জানালার পাল্লার একটা কোন লেগে গেছে কেটে।

শেখর। বটে তা হ'লে আপনার বৌকে ভাল লোক বলতে হবে।

কবি। কি বল যে,—কবিতা বোঝেনা,—গান বোঝেনা,—চোখের ভাষা বোঝেনা,—প্রাণের আকুলতা বোঝেনা,—তাকে বাসতে হবে ভাল,—তাকে করতে হবে আমার কবিতার মানসসুন্দরী!—না, না, তা হয় না। তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—নেই—নেই। তাকে বলেছি যদি তুমি আমায় সুখী করতে চাও শান্তি দিতে চাও ত আত্মহত্যা করে মর।

নরেন। তা তোমার দুঃখ তোমার বাবা মাকে জানাও না কেন? তাঁরাও ত একটা উপায় কিছু করতে পারেন?

কবি। আরে ভায়া! সে বোধ হয় ভৌতিক কিছু জানে। বাবাকে মাকে এমন হাত করেছে যে তাঁরা ত তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী করে ত কাঁধে নিয়ে একেবারে নাচবার যোগাড়। সাধে কি আর বলছি ভাই—"দেবদাস" হয়েছি। কেউ বুঝবে না আমার ব্যথা। আচ্ছা ভাইসব—আমি চল্লাম। আমাকে একবার "বেয়াড়া পত্রিকা"

অফিসে যেতে হবে। উঠি তবে—ওঃ! বড় ব্যথা বড় ব্যথা!

(প্রস্থান)

নরেন। হায় রে বাঙ্গালা দেশ! হায়রে তার কবি! এদের দেখলে সত্যাই দুঃখ হয়। কেন জান? এইসব অকালপক্ক মেরুদণ্ডভাঙ্গা কবির দল, সাহিত্যিকের দল, নাট্যকের দল, ভাবুকের দল—এরা জহরত আর কাচের পার্থক্য বোঝেনা। এরা কাচকে জহর বলে বুকে রাখতে চায় আর জহরকে কাচ বলে দূরে ফেলে দেয়। হা ভগবান! কবে যে এদের চোখ ফুটবে!

শেখর। ওরে তোরও কি শেষে ভাব এলো নাকি নরেন?

নরেন। নারে না,—ভাব আসবে কেন! কিন্তু একটা মতলব এসেছে মাথায়। এই কবিটাকে বেশ একটু জব্দ করতে হবে। যতদূর শোনা গেল—তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে—ঘরে ওর রয়েছে সতী সাধ্বী—পতি-পরায়ণা স্ত্রী,—যে চায় ওর সুখে সুখী হতে—ওর শান্তির জন্য জীবন দিতে, তাকে পায়ে ঠেলে, লাঞ্ছিত করে, অপমান করে এসে এই মহাপুরুষটী চান অন্য আর একজনের সর্ব্বনাশ করতে; প্রেম আর ভালবাসার বুলি শুনিয়ে তার কাছ থেকে বাহবা নিতে!

শেখর। তা তুমি কি করতে চাও শুনি ?

নরেন। করবো আর কি। সুধাকে ত দেখতে বেশ মেয়েলি মেয়েলি। ওকেই মেয়ে সাজিয়ে আমার শালী বলে কবির প্রেমের খোরাক জুগিয়ে দেব।

অতনু। সুধা! তুই রাজি আছিস্ ত মেয়ে সাজতে ?

সুধা। সাজতে পারি—কিন্তু একটা সর্ত্তে।

নরেন। সর্ত্তটা কি শুনি ?

সুধা। সর্ত্তটা এমন কিছুই নয় ;—যে কোন উপায়ে কবিকে সোজা রাস্তায় আনতেই হবে।

নরেন। এই কথা! বেশ—বেশ! এতে ত আমরা সবাই রাজী।

অতনু। যাক্—এবার আমাদের সেই chorus গান খানা গেয়ে শেষ করা যাক আজকের এই আসর।

(গীত)

কোরাস্।

সকলে— আজ আমরা সবাই মিলেছি এক ঠাঁই।
কেন বলতে পার কিসের তরে, কিবা এখন চাই॥

একজন— এমন কিছু চাই না মোরা চাই কি তাই বলি
যারা ভাবছে বসে জীবনটা হায় বৃথাই গেল চলি

অপর একজন—আর বিয়ের আগে প্রেম না হলে কি ছাই তার বিয়ে
এটা এমন কিছু নয় শুধুই অভিনয় সেই তাদের নিয়ে।

সকলে— এতে হয় যদি দোষ করো না রোষ চাইছি ক্ষমা তাই
আজকে তাই আমরা সবাই মিলেছি এক ঠাঁই॥
কেমন করে খুলবে আঁখি চিনবে তারা ভেজাল খাঁটী
যারা জহর ফেলে কাচের লোভে করছে ছুটো ছুটি
সেই তাদের চিনিয়ে দিতে জহর খাঁটী মোদের অভিনয়

একজন— মোদের শুধুই অভিনয়.—

সকলে— এটা এমন কিছুই নয়॥

একজন— এতে হয় যদি দোষ,

অপর একজন—করো না রোষ,

সকলে— চাইছি ক্ষমা তাই।
আজকে তাই আমরা সবাই মিলেছি এক ঠাঁই॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরেনের বসিবার ঘর

নরেন ও কবি।

নরেন। এই যে কবি! এসো—এসো—বসো।

কবি। এই যে বসছি।

নরেন। এটা কি হে?

কবি। কবিতার খাতা।—আমার সাধনার ফল।

নরেন। চমৎকার বাঁধান খাতাটা তো! এই যে আবার সোনালি কালি দিয়ে ওপরে নাম ঠিকানাটাও লেখা রয়েছে।

কবি। হাঁ একটা কথা;—ইনি কলেজে পড়েন, সিগারেট খান কি না জানি না—তাই ভাল দেখে একটিন সিগারেট এনেছি।

নরেন। আজকাল কলেজের মেয়েরা প্রগতিশীল হ'য়ে সিগারেট খাচ্ছে বটে—এমন কি শোনা যায় সন্ধ্যার পর ভাল ভাল হোটেলে গিয়ে মদও একটু আধটু টেনে আসে নাকি, তবে আমার শালী শীলা ও সব দিকে নেই। গান বাজনা কবিতা এই সবে খুব উৎসাহী। তবে তুমি সিগারেট খাওয়াটাকে বেশ পছন্দ কর!

(এমন সময় কবিতা পড়িতে পড়িতে
আপন মনে বিভোর শীলার প্রবেশ)

শীলা। "আছে মনে
যে দিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণ প্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তি ঢালা
চন্দনে চর্চ্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়াল আসিয়া"—,

নরেন। শীলা—Miss. শীলা—এই ইনি হচ্ছেন—হাঁ ইনিই
সুকবি "চন্দ্রশেখর।"

কবি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নমস্কার!

শীলা। হে অজ্ঞাত অপরিচিত কবি! লহ নমস্কার,
হে বন্ধু! হে পরম আত্মীয়! আত্মার
লহ মোর সশ্রদ্ধ নমস্কার!
আপনি—আপনিই সুকবি চন্দ্রশেখর!

কবি। ও নামের একমাত্র অধিকারী আমি,
অন্য কেহ নাহি ধরাধামে।
(পরে নরেনের দিকে চাহিয়া)
কেবা এই বালা?
চকিতে হরিল মনচকোর
আঁধার হলো আলা!

নরেন। মুস্কিল করেছে—আমি ত ভাই কবিতা করে বলতে পারবো না—আমি গদ্য করেই বলছি—ইনি হচ্ছেন আমার শা—(জিভ্ কাটিয়া) না—না,—শ্বশুরের মেয়ে, আমার গিন্নীর বোন্ শীলা! একজন লেখিকা বলা চলে। একটু আধটু কবিতা লিখে থাকেন।

শীলা। লিখি বটে—প্রাণের কথা, গানের ছন্দে দিই তাকে রূপ। কিন্তু কেউ তো বোঝে না আমার সে প্রাণের কথা! সে অন্ধকারে অপ্রকাশিত হয়ে কেঁদে মরে। বড় তাই ব্যথা পাই প্রাণে। কেউ বোঝে না—বোঝে না কেউ।

কবি। শীলাদেবী!—আমি—আমি কিন্তু আজ থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করবো তোমার প্রাণের ভাষা বুঝতে,—তাকে আলোয় টেনে আনতে।

শীলা। পারবেন—পারবেন?—না না—কেন দেখাইছ মোরে মরীচিকা, কেন মোরে শুনাইছ আশার বাণী!

নরেন। ওহো—আমার বড় ভুল হয়ে গেছে—আমার একটা Appointment আছে ভাই; চললাম আমি, Excuse me. Excuse me শীলা। পারি ত ঘুরে আসব। তোমরা কথাবার্ত্তা কও।

(প্রস্থান)

শীলা। সত্যি আপনার অনেক সুখ্যাতি, অনেক নাম, শুনেছি। সত্যি আপনি খুব মহৎ—

কবি। না—না। ও এমন কিছুই নয়। নাম সুখ্যাতি তা'তে ত আর প্রাণের আশা মেটে না, কবিরা চায় ভালবাসা। তা' আর পাচ্ছি কৈ ?

শীলা। তারই বা আপনার অভাব কি ? যে আপনাকে একবার দেখেছে সেই তো ভালবাসবে আপনাকে। এই দেখুন না—বলতে পারছি না, লজ্জা করছে।

(সলজ্জভাবে নীরব)

কবি। বল লো দেবী ! কি চাহিছে প্রাণ তব ? ভাল কি বাসিতে চাহ মোরে ?

শীলা। বলিতে চাহিছে প্রাণ, কিন্তু হায় ! লজ্জা আসি বাধা দেয়। বুঝে নিও মরমে মরম রাখি মোর।

কবি। সত্যি কেউ কোনদিন আমায় ভালবাসেনি—আজ এই প্রথম তোমার কণ্ঠের বাণী আমার হৃদয় সরোবরে প্রেমকমল ফোটাল। আমি—আমিও তোমায় ভালবাসতে চাই !

শীলা। সত্যি !—একি সত্যি, না স্বপ্ন ? আপনি আমায় ভালবাসতে চান !—কিন্তু, এ গর্ব্ব কি আমি চিরদিন করতে পারবো ? না—না, আপনি আমায় ছলনা করছেন।

কবি। বিশ্বাস করুন—সত্যই ভালবাসতে চাই।

লীলা। ওঃ, কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমার এত আনন্দে ভাল লাগছে না বদ্ধ গৃহে থাকতে। মুক্ত বাতাসে চলুন বেড়িয়ে আসিগে।

কবি। তাই চলুন, আমারও প্রাণ তাই চাইছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নরেনের পুনঃপ্রবেশ সঙ্গে অতনু ও শেখর)

নরেন। সত্যি কবিতা করতে করতে মানুষ শেষে গাধারও অধম হয়। এই সব হুটোকে কবিদের ধরে যদি কোন দ্বীপে নির্ব্বাসন দেওয়া যেত ত দেশের মঙ্গল হ'ত? নয়কি অতনু—তুই কি বলিস্?

অতনু। সত্যি—এরা পাগলেরও বেহদ্দ। এদের কাছে মেয়ে পুরুষেরও পার্থক্য নেই বললে চলে।

শেখর। আরে তা' নইলে—সুধাটাকে অমন মেয়ে সাজিয়ে চালান যায়! একটা কথা—সুধাটা কিন্তু ভোলটা বজায় রেখেছে ঠিক।

নরেন। আরে আমি ও সব কিছু ভাবছি না—ভাবছি গাঁথাটা ত ঠিকই হয়েছে—এখন খেলিয়ে তুলতে পারলেই বাহাদুরি। বেশ মোটামুটি কিছু Hand-Note লিখিয়ে নিয়ে বাহ্বাকে বাজীমাৎ করান হবে।

অতনু। যে রকম ভাবে কথা সুরু হয়েছে—তাঁতে বাহাদুর কাত্ না হয়ে আর যায় না। যাক্, আজ এইখানেই শেষ করা যাক্।

—যবনিকা—

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লাব-রুম।

সুধা ও নরেন।

সুধা। আজ নিয়ে কুড়ি দিন কি কাণ্ডটাই না হচ্ছে। তোমরা ত দিব্যি মজা লুট্‌ছো,—কিন্তু আমার যে প্রাণ যায়। কি নরেন দা! চুপ করে কি ভাবছ? সত্যি বলছি—একঘেয়ে প্রেমের বুলি শুনতে শুনতে শেষে সত্যিই না কবির প্রেমে পড়ে যাই। এবার আমায় ছুটী দাও। তুমি ত দিব্যি পঞ্চাশ হাজার টাকার Hand-Note লিখিয়ে নিলে—শেখরকে মহাজন সাজিয়ে আর আমাকে তার উপলক্ষ্য করে।

নরেন। তোমাকে উপলক্ষ্য করে মানে?—বল শীলাকে উপলক্ষ্য করে।

সুধা। আহা তা না হয় তাই হলো—কিন্তু কবে এই ধড়া-চুড়ো ছাড়বো বল ত?

নরেন। আর ত প্রায় শেষ করে এনেছি। এবার একদিন একটা পার্টির আয়োজন হবে এই ক্লাবে।—সেইদিন তুমি তোমার স্বরূপ প্রকাশ করবে। একটা শুভদিন দেখে নাও। তারি অপেক্ষায় যা দেরী।

কবির প্রেম

(অতনু, দুর্ল্লভ ও শেখরের প্রবেশ)

অতনু। এই যে সুধা—না—না—Miss শীলা! কেমন আছ?—কেমন আছেন তোমার কবি বন্ধু?

শেখর। নমস্কার শীলাদেবী! কেমন সিনেমা দেখছেন? ইডেন গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন আর লেকে কেমন বেড়াচ্ছেন?—সত্যি সুধা ভোগ আর স্ফূর্ত্তিতে তুই যেন একটু মোটা হয়েছিস্ রে?

সুধা। মোটা হব না—কি বলিস্? কি স্ফূর্ত্তিতেই না আছি। সত্যি বলছি ভাই—এ ক'দিন মেয়ে সেজেই বেশ বুঝতে পারছি যে—প্রগতি প্রগতি করে মেয়েরা কেন এত চেঁচায়;—তাতে যে কত মজা, কত সুধা তা' তারাই জানে।

শেখর। তাই নাকি?

সুধা। নয় আবার! সত্যি শিক্ষিতা মেয়েরা যদি একটা partner জোটাতে পারে ত তা'দের আর পায় কে? মনের মানুষের স্কন্ধে ভর দিয়ে অনেক সময় চাঁদ ধরবার ও চেষ্টা করে দেখা যায় রে? এই দেখ্ না! আমার মনের মানুষটী আমার মন জোগাতে যা বলছি তাই করছে। সেদিন যেই কাঁদো কাঁদো হয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে বললাম—ওগো! তুমি আমার সব কেড়ে নিতে বসেছ—কিন্তু যেদিন তোমার

নেশা কেটে যাবে—তুমি চলে গেলে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো ?

অতনু। তাতে কি বললে কবি ?

সুধা। বললে—না-না—এ আমাদের স্বপ্ন নয়—এটা ধ্রুব সত্য। তার কি প্রমাণ চাও ?

শেখর। তুই কি প্রমাণ চাইলি ?

সুধা। আমি বললাম,—এর পরে ত আর আমি বিয়ে করতে পারবো না—অথচ মরতেও পারবো না। তা এক কাজ কর না,—আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমিয়ে দাও না Bankএ ? আরে !—বলা মাত্রই কাজ-তারপর দিনই পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক্।

অতনু। তুই তাহ'লে পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক বল্ ?

নরেন। চেকটা ত বাজে। এই দেখ পঞ্চাশ হাজার টাকার Hand-Note আমার কাছে। আমি বরঞ্চ মালিক ? এটা ত আর জাল নয়। কবির সত্যিকারের সই। মনে করলে এখন নালিশের ভয় দেখিয়ে কোর্টের সাহায্য নিয়ে বাড়ী বিক্রী করে এ টাকা আদায় হয়।

দুর্ল্লভ। নরেন তোদের কবি আসছে।

সকলে। আরে তাই নাকি !

নরেন। এই সুধা ! তুই পালা পালা। চট্ করে এদিকের এই দরজা দিয়ে। দেখিস্ যেন দেখতে না পায়—

খুব সাবধানে লুকিয়ে পালা। বোধ হয় এই Club থেকে তোর ঐ খানেই যাবে। এরা না হয় গল্প টল্প করে খানিকক্ষণ ওটাকে আটকে রাখবে।—যা—চলে যা।

সুধা। তাইত!—আমি তা হ'লে চল্লাম।

নরেন। যা যা—আর কথা কসনে। (সুধার প্রস্থান)
আমিও একটু আড়ালে রইলাম। (নরেনের প্রস্থান)
(অন্য সকলে বই খুলিয়া অথবা কাগজ লইয়া বসিয়া গেল, এমন সময় ধীরে ধীরে কবির প্রবেশ)

কবি। কে গো তুমি এলে মোর হৃদয় শ্মশানে,
ফুটাইলে ফুল সেথা!—গানে গানে
ভরে দিলে প্রাণ মন মোর
কেগো, কেগো মনোচোর?
দিব সাজা সাজা দিব বাঁধি
বাহুর বন্ধনে
হে সুন্দরী! তব আত্মা মোর আত্মাসনে
মিলিবে আলিঙ্গনে।

অতনু। অদ্ভুত! অদ্ভুত!

দুর্লভ। চমৎকার—চমৎকার কবিদা; নে নে অতনু ওঠ্—কবিদাকে বসতে জায়গা দে। নিন্ বসুন কবিদা।

অতনু। কবিদা! সত্যি আপনাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

কবির প্রেম

দুর্ল্লভ। কবিদা! কই একটা সিগারেট দাও।

অতনু। সিগারেট কি হবে?—বোতোল টোতোল আছে কিনা দেখ্; আছে নাকি কবি দা?

কবি। না ভাই—ও সব নেশা টেশা আমার সহ্য হবে না বলে আবার ছেড়ে দিয়েছি।—আর তা ছাড়া আমার মানসসুন্দরী চান্না যে আমি নেশা করি। তাঁরই অনুরোধে ও সব ত্যাগ করেছি।

অতনু। অ্যাঁ! মানসসুন্দরী!—বল কি হে!—সে আবার কে?

শেখর। নিশ্চয়ই অপরূপ সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দুর্ল্লভ। সত্যি,—কি করে জোটালে কবিদা!—ওঃ—তাই আর তুমি এদিকে আসনা—তা—আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না?—আমরা কি এতই অসভ্য?

কবি। না—না—তা'কি আমি বলছি!—তিনি অদ্ভুত—বড় কবিতার ভক্ত! কবিতার জন্য তিনি পাগল।

শেখর। কবির জন্যও নিশ্চয় আশা করি।

দুর্ল্লভ। আমরা অকবি—তা বলে কি তাঁর দর্শন পাবারও যোগ্য নই?—হা বরাত!

কবি। ভুল করছ দুর্ল্লভ—ভুল করছ। তিনি চান সকলের সঙ্গেই পরিচিত হ'তে, বিশ্বের সাথে আত্মীয়তা করতে।

শেখর। তাহ'লে এক কাজ করনা—আমাদের সঙ্গ থেকেই বিশ্বের পরিচয়টা সুরু করিয়ে দাও না কবিদা।

দুর্ল্লভ। দাও না বললেই ত আর হয় না—তা হলে এক কাজ করতে হয়।

অতনু। হ্যাঁ—একটা পার্টির বন্দোবস্ত করলে কি রকম হয়? কবিদা বে'তে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান নি।—এখন একটা party ই দিন্ তাঁর বাড়ীতে।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই বেশ ভাল কথা।

অতনু। সেখানে বৌদিকেও দেখা যাবে আর আমাদের দেবীরও সাক্ষাত মিলবে।

শেখর। আর তা ছাড়া একটা বেশ সুবিধেও আছে। কবিদার বাবাও এখন ছুটীতে পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

দুর্ল্লভ। ভালকথা!—তা'হলে কবিদা! পরশুদিন লাগাও party. আমরা কিন্তু উপহার নিয়ে যাব—অবশ্য দুটো দুটো।

অতনু। সে ত নিশ্চয়ই—একটা বৌদির—আর একটা দেবীর।

কবি। বেশ ; তোমরা যখন ধরেছ, আর তার উপর দেবীও কদিন ধরে আমাকে ব্যস্ত কচ্ছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে চান—তখন তাই হোক্। আর বাবাও নেই এখানে,—এমন একটা সুবিধে।

সকলে। Three cheers for কবিদা। Three cheers for কবিদা ! Three cheers for কবিদা !

(নরেনের পুনঃপ্রবেশ)

নরেন। কিরে তোরা এত চেঁচাচ্ছিস্ কেনরে ?—কি হোল ! এই যে কবি ! তোমার ত আর দেখাই নেই—অথচ খবরটি পাচ্ছি ঠিক্।

অতনু। একটা ভোজ ! পরশুদিন কবিদার বাড়ীতে আমাদের ভোজের নিমন্ত্রণ।

নরেন। আরে তাই নাকি ? তাহ'লে ত বড় আনন্দের কথা ! এই এত বড় একটা সুসংবাদের পর তোমরা কি করছ শুনি ! কবির পকেট থেকে একটা বোতল বার কর।

শেখর। না—না,—উনি নেশাটেশা সব ছেড়ে দিয়েছেন ওঁর মানস দেবীর মন জোগাতে।

নরেন। তাই নাকি? এ তো বড় ভাল কথা নয় আমার কাছে।

কবি। না—ওসব ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর নেশার কোন প্রয়োজন নেই।

অতনু। যাক্ ওসব কথা—চল আমরা এখন কবিদাকে সঙ্গে নিয়ে একটু মুক্ত বাতাসে ঘুরে আসি।

সকলে—বেশ, বেশ, তাই চল কবিদা!

চতুর্থ দৃশ্য

কবির বাড়ী—(Party)

কবি একাকী

কবি ! তাইত এখনো কেন শীলা আস্ছে না? ঘরটাতো বেশ তার মনের মতন করে সাজান হয়েছে। তাইত !—এতক্ষণ ত তার আস্‌বার কথা ! (নীরব)— অনেকক্ষণ হয়ে গেল।—এদিকে এদেরও আসবার সময় হল—এই যে শীলাদেবী !—

(শীলার প্রবেশ)

শীলা। "আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী,
দিন চলে যায় আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার প্রয়াসী,
আমি যে সুদূরের পিয়াসী।
সুদূর, বিপুল সুদূর—
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
মোর জানা নাই আছি এক ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাশরী ॥

কবির প্রেম

কবি। "হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা
ওগো তপন, তোমার স্বপন
দেখি যে, করিতে পারিনে সেবা।
তাই কহি আমি কাঁদিয়া
তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া"
হে দেবী! এমন নাহিক আমার বল।
তোমা বিনা মোর ক্ষুদ্র জীবন
কেবলি অশ্রুজল।

শীলা। মাপ করবেন! একটু দেরী হয়ে গেল। তা—বৌদি কোথায় ?—পরিচয় করিয়ে দিন!

কবি। না—না—দেরী কিছুই হয়নি। আপনিই ত প্রথমে এলেন। এখনও আমার বন্ধুবান্ধবেরা কেউ আসেনি। আরে! এই যে—তোমার বৌদি এইদিকেই আসছেন। পরিচয় করিয়ে দিই এস।

শীলা। পরিচয় আমি নিজেই করতে পারি। আসুন বৌদি আসুন—নমস্কার ?

কবি স্ত্রী। নমস্কার!

কবি। ইনি Miss শীলা—সুলেখিকা, আমার পরম ভক্ত!

(দরওয়ানের প্রবেশ)

দরোয়ান। বাবুজি! বাহারসে বহুত বাবু আকে আপ্‌কো সেলাম দিয়া।

কবি। বাবুলোক সব আয়া? আচ্ছা শীলা, তুমি তোমার বৌদির সঙ্গে ততক্ষণ কথাবার্ত্তা কও আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে এক্ষুনি আসছি।

(দরোয়ান সহ প্রস্থান)

শীলা। বৌদি! ভয় পাবেন না; আমি সত্যি সত্যি শীলা নই—আমি সুধীর।

কবি স্ত্রী। অ্যাঁ—অ্যাঁ—।

শীলা। আঃ চুপ্ চুপ্—চেঁচাবেন না।—তা হলে সব মাটী হয়ে যাবে।—ব্যাপারটা আপনাকে সব খুলে বলছি, শুনুন। লজ্জা করবেন না—আমাকে আপনার ছোট ভাই বলেই মনে করবেন।—আপনাকে বিবাহ করবার পর থেকেই কবিদা আমাদের ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছিলেন প্রেম করবার জন্য। তাই এই অভিনয়। এটা শুদ্ধ অভিনয়—সত্যি এতে মোটেই নেই।

কবি স্ত্রী। অ্যাঁ—তাহ'লে আপনি ব্যাটাছেলে?—ওমা!—মিন্সে কি পাগল না কি গো!

শীলা। সত্যিই উনি একটী পাগল। আর—সেই পাগলামি ছাড়াবার জন্যই এই কাণ্ড। তারপর বলি শুনুন।—বসুন এই চেয়ারে। হঠাৎ একদিন মদ খেতে—নেশা করতে সুরু করলেন।—কারণ উনি চান প্রেম করে বিয়ে করতে।—আপনাকে যে বিয়ে করেছেন

সেটা ভুলতে চান। তাই মতলব করে—সবাই মিলে আমাকে মেয়ে সাজিয়ে এই কাণ্ড!

কবি স্ত্রী। ওমা! কি কেলেঙ্কারী গো! কি লজ্জা!

শীলা। তারপর শুনুন—আমাকে কত প্রেমের কথা শুনালেন—কত ব্যথার কথা বললেন—আমার জন্য প্রাণ দিতে পারেন এও শপথ করলেন। সেই সব দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কায়দা করে মোটা মোটা টাকা ধারের হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে—হাতে আনা হয়েছে। এইবার তাঁর ভুল ভেঙ্গে দিয়ে—এমন করে চোখ ফোটান হবে—যাতে আর কখনও বাইরে প্রেম করবার নামটী পর্য্যন্ত মুখে না আনেন,—যাতে আপনার উপর আর কোন অত্যাচার বা অবিচার করবার সাহস পর্য্যন্ত না পান;—তারি জন্য এই অভিনয়! —আর একটুখানি ধৈর্য্য ধরে থাকুন বৌদি!

কবি স্ত্রী। বেশ,—আমি তা হলে চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে থাকবো—ঐ উনি আসছেন।

(কবি ও অন্য সকলের প্রবেশ)

কবি। এসো—এসো বন্ধুসব!—পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের সঙ্গে।—ইনি তোমাদের বৌদি,—আর ইনি একজন সুলেখিকা—আমার পরম ভক্ত।

কবির প্রেম

সকলে। নমস্কার!

লীলা। নমস্কার!

অতনু। কবিদা! প্রথমে আমাদের উপহার অর্থাৎ দর্শন-দক্ষিণাটা দেওয়া হয়ে যাক্। খাওয়া-দাওয়ার পর—বসে গল্প হবে—কি বলছে তোমরা?

সকলে। হাঁ—হাঁ—সেই ভাল কথা।

কবি। বেশ তাই হোক্।

অতনু। বেশ—তাহলে আমিই প্রথমে সুরু করি। দেখুন যদিও আমি অকবি, তবু আজ একটা কবিতা এনেছি—আপনাকে শুনতেই হবে আর এই সামান্য ফুল এনেছি—নিজ হাতে সাজিয়ে দি. আসুন আপনার কবরী—

হে দেবী! বহুরূপে বহুবার
দাও দেখা মোরে
কে বুঝিতে পারে তব ছলনা!
হে ছলনাময়ী! এ বিশ্বচরাচরে।
চোখ আছে তবু অন্ধ,—মাণিকেরে
ফেলি দূরে
মাণিক বলিয়া রাখি যতন করে
মাটির ঢেলারে॥

আসুন,—এইবার নিজহাতে সাজিয়ে দি আমার সামান্য ফুলে আপনার কবরীখানি—

(ফুল গুঁজিতে গিয়া পরচুল সরিয়া মাথার খানিকটা দেখা গেল)

সকলে। একি! একি! পরচুল যে!

অতনু। তাইত! তাইত!

(একটানে চুলটা চলে আসে)

কবি। অ্যাঁ! অ্যাঁ!—একি হেরি!

কবি স্ত্রী। ওমা এযে পুরুষ মানুষ গো! ওমা কি লজ্জা!

(নরেনের প্রবেশ)

নরেন। এত চেঁচামেচি কিসের হে!—এ আবার কি!

শেখর। আরে আরে কবিদা! একটা বেটাছেলেকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে চালাতে চাও আমাদের কাছে! আরে—এরি তুমি প্রেমে পড়েছ!

দুর্লভ। আরে ছ্যা ছ্যা!

নরেন। এ যে সুধা!

কবি। (স্বগত) ওঃ! কি ভুল করেছি! কি লজ্জা! কি লজ্জা! —কে জানত এও বরাতে ছিল। (প্রকাশ্যে) তোমরা আমায় ক্ষমা কর ভাই ক্ষমা কর। জীবনে বেশ শিক্ষা পেলাম—সত্যি এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম। এবার চোখ পেয়েছি ভাই।

কবি স্ত্রী। হ্যাঁ গো! এ সব কি ব্যাপার বলত! আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

নরেন। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি বৌদি! কবিদা আমাদের—এতদিন আপনার সঙ্গে সুর মেলাতে না পেরে একজন মেয়েমানুষ সাজা বেটাছেলের সঙ্গে প্রেম করে এসেছিলেন। আজ যে ভুল তিনি এতদিন করেছেন তা বুঝতে পারলেন।—যদি সত্যি তাঁর চোখ ফুটে থাকে বুঝতে পেরে থাকেন,—তাহলে আর জীবনে কোনদিন প্রেম করবার কথা মনেও ভাববেন না—আর অন্য কোন মেয়ের সৌন্দর্য্য দেখে কবিতা লেখবার চেষ্টাও করবেন না।

কবি। ক্ষমা কর—ওগো ক্ষমা কর। তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি কত অপমান করেছি—তারি ফলে আজ আমার এই সাজা! সত্যি আজ থেকে জীবনের গতি উল্‌টে দিলাম।—এক স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও কথা আমার মনের কোণেও ঠাঁই পাবে না।—তুমি—তুমিই আজ থেকে আমার সব।

নরেন। আর কোনদিন প্রেমের কথা মনেও এনোনা কবি! যদি এতেও তোমার শিক্ষা না হয় তা হলে মনে আছে এই ৫০ হাজার টাকার Hand Note টার কথা?—লীলা না হয় শেষে সুধীর হলো;—কিন্তু এটা ত আর বাজে নয়,—এতে তোমার সই আছে

৩—

মনে থাকে যেন।—যাক্—এটা আপাততঃ বৌদি, আপনাকেই উপহার দেওয়া যাচ্ছে।

কবি। আর দেখ্ ভাই নরেন! তোরা এ লজ্জার কথা আর কাহাকেও জানাস্‌নে; আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে —আমার প্রেমের মোহ এইখানেই শেষ! জীবনে বিয়ে করেছি যাকে তাকে নিয়েই সুখী হব।

সকলে। সত্যি তাহলে প্রেমের মোহ কেটেছে তোমার? আমাদের বড় আনন্দ হচ্ছে কিন্তু।

শীলা। অ্যাঁ—তোমার প্রেমের মোহ কেটে গেল,—তা হ'লে আমার কি হবে?

নরেন। তোমার আর কি হবে? অভিনয়ের পালা এইখানে একখানা গান শুনিয়ে শেষ কর।

কবি, এবার দাও হে বিদায় মোরে।
অভিনয় শেষ করে যাই ঘরে আপন ফিরে॥
কত মধু আছে প্রেমে হলো ত ভাই এবার জানা।
প্রেম-ব্যাধি হায় এলে মনে, হারিয়ে ফেলে বিবেচনা॥
সোনার হরিণ লোভে মিছে অন্ধ হয়ে ঘুরে মরে।
এবার দাও হে বিদায় মোরে॥
হাতের কাছে আসল ফেলে ধরতে ছোট মরীচিকা।
তুলিতে ফুল গিয়ে শেষে সার হয় হাতে কাঁটা ফোটা॥
তাইতো বলি বৌ নিয়ে ভাই মনের সুখে থাক ঘরে।
এবার দাও হে বিদায় মোরে॥

"Letter box" লেটার বক্স।

(নাটক-নক্সা)

স্থান—লেটার বক্স্। সময়—clearanceয়ের কয়েক সেকেণ্ড্ পরে।

সাধারণ পত্র—এই যা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ফেল করলাম গা। না জানি কতক্ষণ আবার—এইভাবে পড়ে থাকতে হবে। যাক্ কি আর করা যায়, এককোণে চুপ করে বসে থাকি!

(এমন সময় দুর্ঘটনা পত্রের প্রবেশ আর প্রবেশের পর)

দুর্ঘটনা পত্র—উহু—বড় ব্যথা, বড় ব্যথা! হায় এমন বরাত শেষে আমাকেই এই দারুন দুঃসংবাদটা নিয়ে যেতে হচ্চে গা।

সাধারণ পত্র—(স্বগত) আহা বড় ব্যথা পেয়েছে হয়ত বেচারা! দেখি যদি কিছু স্বান্তনা দিতে পারি (প্রকাশ্যে)—নমস্কার!

দুর্ঘটনা পত্র—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে)—নমস্কার।

সাধারণ পত্র—আপনি কি বড় আহত? আমার দ্বারা কি কিছু কাজ হতে পারে আপনার?

দুর্ঘটনা পত্র—কাজ! না—না—না, এ দুঃসংবাদ আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। কেউ আমায় সাহায্য করতে

পারবে না! উহু! তা আপনি কে? কোথায় যাবেন?

সাধারণ পত্র—আজ্ঞে! দেখুন আমি সাধারণ পত্র! বিজন বাবুর পরিবারের সাধারণ ঘরোয়া সংবাদ নিয়ে চলেছি বর্দ্ধমানে তাঁর বড় ভাই সুদীন বাবুর কাছে। আপনি কে? কি আপনার ব্যথা?

দুর্ঘটনা পত্র—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে)—উহু—বড় দুঃসংবাদ! সে বড় দারুন দুঃসংবাদ! ঢাকার জমিদার সুধীর রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র দীনবন্ধু কলকাতায় এসেছিলেন পূজায় বেড়াতে। রোগে নয়, জ্বালা যন্ত্রনায় নয়—সে দিন বিকালে বড়বাজারের একটী রাস্তায় এক ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লেন একটী লরির চাকায় তারপর যা হয়েছে বুঝতেই পাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এই দুঃসংবাদটী শেষে আমাকেই নিয়ে যেতে হচ্ছে তার বাবা মার কাছে—উহু—বড় ব্যথা ভাই, বড় ব্যথা।

(এমন সময় ডাকাতিপত্রের প্রবেশ। হঠাৎ ডাকাতিপত্রের প্রবেশে দুর্ঘটনা ও সাধারণ পত্র উভয়ে চীৎকার করে)।

উভয়ে—কে! কে! কে আপনি?

কবির প্রেম

(সাধারণপত্র দুর্ঘটনা পত্রের কাণের কাছে মুখ নিচুকরে চুপি চুপি)

সাধারণ পত্র—ওকি! কি বিশ্রী চেহারা!

ডাকাতিপত্র—নমস্কার! ভয় পাবেন না! আমি ডাকাতি পত্র মাত্র! ডাকাত নই।

(দুর্ঘটনা ও সাধারণ পত্র চমকে উঠে জড়িত স্বরে।)

উভয়ে—এ্যাঃ এ্যাঃ ডাকাতি পত্র!

ডাকাতিপত্র—হাঁ—আমি ডাকাতি পত্র! দেখছেন না বেয়ারিং হয়ে যাচ্ছি! আমায় যিনি পাঠাচ্ছেন তিনি ডাকাতদের সর্দ্দার। জানিনা কেমন করে জানতে পেরেছেন শান্তিপুরের রায় সন্তোষ বাগ্‌চী বাহাদুর মহাশয় কিছু পয়সা করেছেন, তাই তাঁর কাছে এই সংবাদ নিয়ে যাচ্ছি, যদি তিনি তাঁদের গ্রামের দরিদ্র দুঃখীদের জন্য একটী ছোট হাসপাতাল আর একটী স্কুল করে না দেন ত তাঁর বাড়িতে ছ' মাসের মধ্যে ভীষণ ডাকাতির সম্ভাবনা। তা যাক্ এখনও দেখছি clearanceয়ের কিছু দেরী আছে। আসুন ততক্ষণ আপনাদের সঙ্গে আলাপ করা যাক্।

সাধারণ পত্র—তা বেশ! আসুন আসুন, ইনি দুর্ঘটনা পত্র, যাবেন ঢাকায়। আর আমি সাধারণ পত্র, যাব বর্দ্ধমানে।

(এমন সময় গানপত্র প্রবেশ করিতেছিল)

ডাকাতিপত্র—ঐযে আবার কে যেন এদিকে আসছে। বেশ আনন্দের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে॥

(গানপত্র প্রবেশ করে সকলের সম্মুখে এসে)

গানপত্র—নমস্কার—আমি কে ভাবছেন?—আমি গান!

সাধারণ পত্র—আপনি গান! তা বেশ বেশ—কোথায় যাবেন?

গানপত্র—(গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) হুঃ—যদিও গান তবে একটুখানি—মুস্কিল কি জানেন?—বিরহ সঙ্গীত আমি, মিলন গীতি নই। যাব তেমন বেশী দূর নয়! এই শ্রীরামপুর—কল্যানী সোমের বাড়ী।

ডাকাতিপত্র—কল্যানী সোমের বাড়ী! বিরহ সঙ্গীত! ব্যাপারটা একটু রহস্য রহস্য মনে হচ্ছে যে!

গানপত্র—রহস্য তেমন কিছু নয়! তা হলে খুলেই বলি! যার কাছ থেকে আমি আসছি তিনি সুগায়ক সুরেশ বাবু। এঁরি ছাত্রী কল্যানী সোম—আগে গান শেখাতেন। তারপর মনে মনে প্রেমে পড়েছিলেন। সাহসের অভাবে মুখ ফুটে

কিছু বলতে পারেন নি। ফলে কল্যানীর অন্য জায়গায় বিয়ে হয়। বিয়ের পর ইনি গান লিখে পাঠান। গান অর্থাৎ এই বিরহ সঙ্গীত অর্থাৎ যক্ষরাজ দেবদত্তের মেঘদূতের মত আমি চলেছি ডাকদূত।

সাধারণ পত্র—যাক্ একঘেয়েমীর মধ্যে তবুত আপনি বেশ আছেন!

গানপত্র—হাঁ তা যা বলেছেন, বেশ আছি বই কি! মিলনের চেয়ে বিরহের গানই ভাল!!

(এমন সময় প্রেমপত্রের প্রবেশ)

প্রেম পত্র—নমস্কার!

সকলে—নমস্কার!

সাধারণ পত্র—(স্বগত) কি সুন্দর চেহারা! কি সুন্দর সুগন্ধ ওর গা থেকে ভেসে আসছে।

প্রেম পত্র—আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি কে! না না—চুপ করে রইলেন যে, তা হলে খুলেই বলি আমি প্রেম পত্র!

সকলে—সত্যি আপনি বড় সুন্দর।

প্রেম পত্র—এতেই সুন্দর বলছেন—শুনুন বলি তবে। প্রভা বসুর নাম শুনেছেন? রায় সাহেব অতুল

বন্ধুর মেয়ে ? বাবুর্চি লেনে বাড়ী। তারি কাছে যাচ্ছি। প্রথম নয়, পুরাতন প্রেম পত্র।

সাধারণ পত্র—না সত্যি আপনি বেশ জমিয়ে তুলছেন।— তাহলে প্রেমের গল্পটা খুলেই বলুন শুনি।

প্রেম পত্র—গল্প আর কি, খুবই সাধারণ ঘটনা। এরকম ঘটনা নিয়ে কত লাখ্ লাখ্ গল্প হয়ে গেছে।

ডাকাতিপত্র—আহা হা! তবু আপনি বলুন।

প্রেম পত্র—তবে শুনুন—নির্ম্মল ভট্টাচার্জ্জি আর প্রভাদেবী পড়তেন একই কলেজে! সিঁড়িতে উঠতে নামতে কতবার হতো ওদের দেখা সাক্ষাৎ। সেই থেকে হলো ওদের চোখে চোখে আলাপ। তারপর হঠাৎ একদিন প্রভাদেবীর প্রয়োজন হলো নির্ম্মল বাবুর হাতের বই খানা। তারপর চললো একসঙ্গে সিনেমা, লেকে বেড়ান, এমন কি বালির পুলে হাওয়া খাওয়া পর্য্যন্ত। বেশ জমে উঠল প্রেম, আর বেড়ে চলেছে দাদা পাতার পর পাতা আমার এই চেহারাখানা! দেখছেন না এক আনায় হয়নি, ছ পয়সায় হয়নি দুআনার টিকিট রয়েছে কপালে!

ডাকাতিপত্র—যাক্ আপনার সৌজন্যে আমরা যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। ঐযে ও আবার কে আসছে দেখত।

কবির প্রেম

সাধারণ পত্র—আপনি কে ?

(শুভ-বিবাহ-পত্রের প্রবেশ)

শুভ-বিবাহ-পত্র—আপনারা সকলেই ভাবছেন আমি কে। কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি।

সকলে—নমস্কার! কিন্তু আপনি কে ?

শুভ-বিবাহ-পত্র—আমি ? আমি হচ্ছি—

নমঃ শ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

সবিনয় নিবেদন !

মহাশয় আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিমান বাবাজীবনের সহিত রংপুর নিবাসী ৺কমলেশ ভাদুড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শ্রীলেখাদেবীর শুভ বিবাহ। আপনার উপস্থিতি প্রার্থণীয়। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি— বিমল দেবশর্ম্মা।

সাধারণ পত্র—ও আপনি তাহলে দারুন সুসংবাদ—শুভবিবাহ !

দুর্ঘটনা পত্র—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) হা বরাত ! এখনও বাঙ্গালা দেশে তাহলে শুভবিবাহ চলছে! হায় ভগবান !

সাধারণ পত্র—এইটুকুনিই তো আমাদের আনন্দ ভাই, এইটুকুনিই তো আনন্দ। ভেবে দেখ এরপর আমরা কে কোথায় থাকবো। নিজেদের নিজেদের গন্তব্য স্থানে চলে যেতেই হবে। আর হয়ত এমন করে কোন দিনই আমাদের দেখা হবে না—

দুর্ঘটনা পত্র—আর কত দেরী clearanceয়ের।

সাধারণ পত্র—ঐ যে চাবি খুলছে! এইবার clearanceয়ের সময় হলো। এই খানেই আজ আমাদের শেষ !!

—শেষ—

অন্তর-দৃষ্টি

(ছোট গল্প)

চোখের সামনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা তার আগে অতি বিশ্বাসী বন্ধুর মুখে শুনেও বিশ্বাস আসে না। কাজেই আমাদের বিশ্বাসের মূল্য কি! আমি যদি বলি জমিদার দাতারাম রায়ের পরমা সুন্দরী একমাত্র কন্যার বিয়ে হয়েছিল তাঁরি বাড়ীতে পালিত অজ্ঞাত কুলশীল, কুৎসিত, তাঁরি দয়ায় উচ্চ শিক্ষিত উৎপল সেনের সঙ্গে, যারা ব্যাপারটা খোলাখুলি ভাবে জানেন না তাঁরা হেসে উঠবেন, আর যাঁরা সিনেমায়, ইডেনগার্ডেনে, লেকের ধারে বালির পুলে দেখেছেন, বিয়ের আগে দাতারাম রায়ের কন্যা কল্পনাকে বিলাত ফেরত বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব লম্বা চওড়া চেহারা ফুটফুটে রং প্রকাশ বাবুর সঙ্গে নির্জ্জনে বসে প্রেমালাপ করতে, তাঁরাও বলবেন, আমি পাগল—অথচ আমি বলছি, সত্যি কল্পনার বিয়ে হয়েছে—উৎপল সেনের সঙ্গে—আর এটাও জানি বিয়ের পর উভয়েই সুখী।

ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি—কল্পনা রায় আর উৎপল সেন পড়তো একই কলেজে, একই সঙ্গে আইএ, কল্পনা বৃদ্ধ জমিদার দাতারাম বাবুর একমাত্র কন্যা, মা-মরা হলেও আদর

যত্নের অভাব ছিল না। আর অন্য কিছুরই যে অভাব ছিল না, এ কথা বলার কোন প্রয়োজনই মনে হয় না। উৎপল ভাল ছেলে, ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। সংসারে সে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই তার আত্মীয় পরিচয় দেবার মত। নিজের খরচা চালিয়ে চলে তার দিন। মাঝে মাঝে আসে অভাবের ঢেউ। বুঝি বা ভেসে যায় তার লেখাপড়া, শেষ হয়ে যায় তার সব আশা। এমন সময় একদিন কল্পনার গাড়ী কলেজের গেটে ঢুকতে গিয়ে মারলে এক ধাক্কা উৎপলকে। আঘাত সামান্য হলেও উৎপল ছিটকে গিয়ে হয় অজ্ঞান।

হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাবার পর তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তার আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা। সে বলে আত্মীয় স্বজন বলতে তার আছে একটা কুকুর। আর তারি সঙ্গে সে থাকে কোন একটা বস্তির একটী ছোট ঘরে। পড়াশুনা আর টিউসানি করে তার দিন চলে। আঘাত সে পেয়েছিল অল্পই, কাজেই অল্পদিনেই সেরে উঠল সে, তবে যে কদিন সে ছিল হাসপাতালে রোজই সন্ধ্যার সময় তাকে দেখতে আসতেন দাতারাম বাবু আর তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা কল্পনা নিয়ে আসতেন সামান্য ফল আর আপ্যায়িতের একটু হাসি।

কয়দিন হাসপাতালে থেকে আসার ফলে গেল তার টিউসানিগুলো। বেচারা করে কি, আবার সময় বুঝে এলো চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে নানান্ অভাব। অভাবের

কবির প্রেম

ঘূর্ণিপাকে অস্থির হয়ে একদিন জমিদার দাতারাম রায়ের দরবারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে সে হাজির হলো। জমিদার বাবুও নামের সার্থকতা বজায় রাখেন। তাকে তাঁরি বাড়িতে একটু স্থান দিয়ে তার পড়াশুনার খরচা নিলেন নিজের ঘাড়ে। সুরু হলো জমিদার বাড়ীতে উৎপলের নূতন জীবন। কল্পনা উৎপলকে অবজ্ঞার চোখে না দেখলেও দয়ার চোখেই দেখতে লাগল, কাজেই দয়ার উপর চলে তাদের উভয়ের একসঙ্গে লেখাপড়া খেলাধুলা, কাজেই অজানিতে হয় তাদের বন্ধুত্ব। অল্প একটু ভালবাসার যে আভাস ছিল না তা নয়। ছিল, তবে মুস্কিল হচ্ছিল উৎপলের ওই বিশ্রী চেহারাটা, কারণ কল্পনার রূপের কথা তুললে অনেক দেশী বিদেশী সুন্দরীর কথা তুলে বোঝাতে হয়, অল্প কথায় তাকে পরমাসুন্দরী রূপসী উর্ব্বশীর মত বললেই যথেষ্ট হবে। দু'জনেই এক সঙ্গে পাশ করলে যেদিন, সেদিন কি ধূমধামের না আয়োজন হয়েছিল জমিদার বাড়ীতে। যদিও কল্পনা কোন রকমে পাশ করেছিল, আর উৎপল হয়েছিল ফার্ষ্ট।

জমিদার বাড়ীর পাশের উৎসব রাত্রে প্রথম আলাপ হলো বিলাত ফেরত প্রকাশ বাবুর জমিদার কন্যা শিক্ষিতা কল্পনা রায়ের সঙ্গে। তারপর চলে তাদের অবাধে মেলামেশা। প্রকাশের গায়ের রং, চেহারার সৌন্দর্য্যই শুধু নয়, তার বিলাতি কায়দার গুণও কাজ করেছিল যথেষ্ট কল্পনার মনে। কল্পনা ত

কবির প্রেম

কত রাত্রি সুধু ভালবাসার স্বপ্ন দেখে জেগে কাটিয়েছে, আর প্রকাশ! সে জানে বিলাতি কায়দায় অভিনয় করতে। যে দেশে খুন হয়—অথচ খুনীর হাতে লাগে না রক্তের দাগ। সে চায় কল্পনাকে একান্ত আপনার করে ছবির বইয়ের পাতার ছবির মত—যতদিন না পাতা উল্টে আর একখানা পাতার ছবি আসে তার সামনে। মুখে সে বলে, লম্বা বক্তৃতা দিয়ে—নারী রত্ন অমূল্য, মনে জানে নারীর আবার মূল্য কি! পুতুল খেলার পুতুল। তাই যেমন খুসি তেমনি করে নাচিয়ে চায় সে ফেলে দিতে। কল্পনার সম্বন্ধে তার ওই একই মত। কিন্তু বাহিরে সে বজায় রেখেছে সবই। নির্জ্জনে বসে কল্পনার একটী সুন্দর হাত নিজের হাতে নিয়ে শুনায় তাকে কত প্রেমের কূজন গুঞ্জন, এমন ও সে বলে কল্পনাকে—সে তার জীবনের আলো। সে চলে গেলে তার জীবন হবে অন্ধকারময়। কল্পনা সরল প্রাণে বিশ্বাস করে চেয়ে থাকে প্রেমের উদাস চোখে প্রকাশের মুখের দিকে, প্রাণ তার চায় প্রকাশকে আরও ভালবাসতে আরও, তার বুকের কাছটিতে টেনে নিতে। এই ভাবে যখন চলেছে তাদের প্রেমের অভিনয় চরম পর্য্যায়, সেই সময় এতদিনের সঞ্চিত ভালবাসা একদিন কোন বাধা আপত্তি না মেনে প্রকাশ পায়। নির্জ্জনে একাকী কল্পনাকে পেয়ে উৎপল বলে সে তাকে ভালবাসে, এবং সে জানে কল্পনাও তাকে ভালবাসে। কাজেই তাদের বিয়ে হলে তারা উভয়ে জীবনে সুখী হবে। কল্পনা তাকে

সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল—এটা তার ভুল। সে তাকে মোটেই ভালবাসে না। বিয়ে তাদের অসম্ভব। সে ভালবাসে প্রকাশকে। তা ছাড়া উৎপলকে সে নির্জ্জনে দেখলে ভয় পায়। ভয় পাবার কারণ তার ঐ বিশ্রী চেহারা। আর জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা উৎপল বাবু, আমার পিতার স্নেহের প্রতিদানেই কি আপনি আমায় বিয়ে করতে চান? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে কোথায় যে উৎপল নিরুদ্দেশ হলো তার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

এরপরও চলেছিল আরও কিছুদিন কল্পনা আর প্রকাশের সিনেমা, থিয়েটার, লেকে বেড়ান, নির্জ্জনে প্রেমের কূজন, কল্পনার মনে হয়েছিল কি সুন্দর এই জীবন। প্রকাশ ছিল সুযোগ খুঁজতে পালাবার। সুযোগ না এলেও ঘটল এক বিপদ যেদিন কল্পনা জানলে নির্জ্জনে চুপি চুপি শীঘ্রই তাদের বিবাহের প্রয়োজন নচেৎ সমাজে আর স্থান নেই। সেই দিনই প্রকাশ এক চিঠি পায় বিলাত থেকে—শীঘ্রই বম্বাইয়ে আসছে তার বিলাতে বিবাহিত স্ত্রী Mrs. মেরী গুপ্ত, তিন চারটী ছেলে মেয়ে নিয়ে। চিঠিখানা পেয়ে সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। তাই টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় চিঠিখানা রেখে মনের রাগ দূর করতে বাড়ীর পিছনের বাগানে যায় পায়চারি করতে। সেই সময় বুঝেই এসে হাজির কল্পনা, সেই টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে চাকরকে সে পাঠায় প্রকাশ বাবুকে ডেকে আনতে।

তারপর নজর পড়ে চিঠির তলার নামটার উপর—Mrs মেরী গুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হয় তার প্রত্যেক শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে ; রাগে দুঃখে নিজের ভুলে কেঁপে উঠল তার সমস্ত শরীর, যখন প্রকাশ এসে ঘরে ঢুকেছে তখনও চিঠিখানা ছিল তার হাতে। প্রকাশ কল্পনার হাতে চিঠিখানা দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চিঠিখানা নিতে যাবে এমন সময় কল্পনা চিঠিখানা মুড়ে নেয় তার হাতের মুঠির মধ্যে। তারপর যা নয় তাই বলে সে অপমান করতে থাকে প্রকাশকে। প্রকাশ তখন জোরে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে এক ঝটকানি দেয় কল্পনাকে, কল্পনা ছিটকে গিয়ে পড়ে একটা আলমারির উপর আর আলমারির তাকে ছিল এক বোতল এসিড, সেই বোতল উলটে এসিড পড়ে কল্পনার চোখে মুখে।

হাসপাতালে দেখা গেল কল্পনাকে অন্ধ। দুটী চোখই তার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সারা মুখখানায় পোড়ার কাল দাগ। দাতারামবাবু কন্যার নির্ব্বুদ্ধিতায় বুড়ো বয়সে পেলেন এক দাগা, যখন সব কিছুই জানতে পারলেন। এখন আর উপায় কি দুঃখ করা ছাড়া। প্রকাশ সেই ঘটনার পরে কোথায় যে উধাও হলো তার খোঁজ কেউ পেলেনা। তার এই আকস্মিক অদৃশ্য হওয়ার ফলে বাড়ীওয়ালার তিন মাসের ভাড়া গেল মারা, আর চাকর চাকরাণীদেরও তাই। ঘরের আসবার পত্র যা ছিল ভাড়া করা। তারও ভাড়া মারা গেল। তবে জিনিষগুলো সবিই পেয়েছিল ফেরত।

অন্তরদৃষ্টি

বৃদ্ধ জমিদার দাতারাম রায়ের অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল কল্পনার বিয়ে দিতে উৎপলের সঙ্গে। শেষের দিকে মত বদলে ছিলেন মেয়ে সুখী হবে জেনে প্রকাশ যদি বিয়ে করে তা'কে। তারপর একেবারে গেল সব উলটে পালটে। কল্পনার আবার বিয়ের কথা ভাবা ত দূরের কথা, তার অনাগত ভবিষ্যতের কথা মনে হলে গা ওঠে শিওরে।

এমনসময় একদিন এত ভাবনা দূর করে দিতে, মরণ-বাঁচন সমস্যার সমাধান করতে এলো একখানা মোটর গাড়ী সন্ধ্যার সময় জমিদার বাড়ীর সামনে। গাড়ী থেকে নেমে সোজা এসে হাজির হলো কল্পনার ঘরে উৎপল। কল্পনা অন্ধ, কাজেই পায়ের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলে, কে? উৎপল বলে, আমি—তোমার অনুগৃহীত বন্ধু। আজ কল্পনা, তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। যে এই পৃথিবীর বুকে হাসিকান্নার মাঝে আসছে নিঃসহায়, তা'কে তার পরিচয় দেবার মত অন্ততঃ কিছু আজ আমায় দিতে দাও। আজ তোমার কোন আপত্তি আমি মানতে রাজি নই এমনসময় সেথায় আসেন জমিদার দাতারাম রায়। পুত্রস্নেহে পালিত উৎপলকে আবার ফিরে আসতে দেখে এই এত আঘাতেও তিনি যেন একটু সান্ত্বনা পেলেন। কল্পনা আজ দেখতে না পেলেও তার দু'চোখভরে এসেছিল জল, আনন্দে। দাতারামবাবু উৎপলের কথা শুনে বললেন—দেখ বাবা, যা

৪—

হবার তা'ত হয়েই গেছে, কেন আর তুমি তোমার নিজের জীবনটা ওর দুঃখের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে চাও। উৎপল আজ মরিয়া। সে বলে—যা হবার তা'ত এখনও শেষ হয়নি। আমি চাই তার শেষ করতে। নূতন যে আসছে ধরণীর আলোয় তার নিজের পরিচয়ই যথেষ্ট হবে না, চাই তার পিতার পরিচয়, নচেৎ ব্যর্থ হবে তার আসা। তাই তাকে সেই পরিচয় দেবার সাহায্য থেকে আমায় মিছে বাধা দিয়ে নিরাশ করবেন না।

তারপর খুব সামান্য আয়োজনেই শেষ হয় তাদের বিয়ে।

একঝোঁকে বিমল এতখানি বলে যেন হাঁপিয়ে পড়েছে মনে হলো। ধূর্জ্জটী তাই বললে—এবার একটু জিরিয়ে নাও—যাক আজ সকালে চায়ের সঙ্গে তোমার এই মজাদার গল্পটা বেশ লাগছে—হাঁ, বলি তারপর তাদের খবর আর কিছু জান?

রমেশ ছিল এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে, হঠাৎ সে সেই রকম গম্ভীরভাবেই বলে উঠল—আচ্ছা বিমলবাবু, আপনার গল্পের নায়ক নায়িকার বিবাহ ত হলো, কিন্তু শুভদৃষ্টি হয়েছিল কেমন করে?

বিমল আবার সুরু করে—হয়েছিল বৈ কি! তবে বলি শুনুন —তার পরের খবর তাদের ভালই, কারণ কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন দেখা হয়েছিল উৎপলের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম— কেমন আছ উৎপল? উত্তরে সে বলেছিল—বেশ ভালই। পরে তার বউ কল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে যা বললে,—ভারি মজার কথা! তার বৌ নাকি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। আমি ত

শুনে প্রথমটা খুব অবাক হয়ে গেলাম, বললাম—বল কি হে! হঠাৎ দৃষ্টি ফিরে পেলে কেমন করে!

সে তখন বললে—একদিন রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ বৌ বলে উঠল আমার বুকের উপর তার মুখখানা রেখে—আমায় সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বলতে সুরু করলে—সত্যি তুমি কি সুন্দর! তার কথা শুনে আমি অবাক! ঘরের গাঢ় অন্ধকারে আমি আমার সহজ ভাল চোখ নিয়ে বুকের উপর তার মুখ তাই ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না, আর সে বলে কি না আমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে! ভাবলাম—হায় ভগবান, শুধু অন্ধ ছিল এবার আবার মাথার দোষ দিলে হরি! এমন সময় সে আবার বলে উঠল—ওগো আমায় বিশ্বাস কর! তুমি ভাবছ আমি অন্ধ, কি করে তোমায় দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তুমি কি বুঝবে আজ আমি চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তরদৃষ্টি পেয়েছি—যাক, তারপর আমিও মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, বললাম—সত্যিই অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তোমার এই বাহিরের রূপটাই সব নয়।

তারপর বিমল আমাদের দিকে চেয়ে বললে—সত্যি ধূর্জটী বাহিরের দৃষ্টি দিয়ে লোকের রূপ বিচার করে আমরা কতখানি যে ভুল করি তা' আমরাই জানি না। অথচ প্রকৃত রূপ যা, তা' থাকে লোকের অন্তরে, আর সেই রূপ দেখতে গেলে চাই অন্তরদৃষ্টি।

এই বলে বিমল শেষ করলে তার মন্তব্য।

—একার—

জীবনের গতি

(ছোট গল্প)

জীবনে কখন কা'র কি ঘটে তা' ভাবতে গেলে ভাবনা সাগরের অকূলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে অস্থির হতে হয়। জীবনে ভবিষ্যৎটা না ভেবে বর্ত্তমানকেই ভালভাবে কাজে লাগিয়ে নেবার চেষ্টা করা ভাল, আর তা' ছাড়া ভবিষ্যৎকে কাছে আসতে গেলে এই বর্ত্তমান সদর দরজা দিয়েই আসতে হবে, এ ছাড়া অন্য কোন পথ তার নেই। তাই সুদূর ভবিষ্যৎকে পাশে ফেলে রেখে বর্ত্তমানকে ভালভাবে উপভোগ করে নেবার উদ্দেশ্যে, শ্রীমান গোবর্দ্ধন সেদিন নির্জ্জনে একাকিনী পেয়ে বীণার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আর অপর হাতে বীণার কপালের অগোছাল চুলগুলি সরিয়ে পাশে গুছিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে—বীণা! এখানে যখন আমাদের বিবাহ একেবারে অসম্ভব—সমাজ শাস্ত্র নিয়মে যখন আমাদের বিবাহ হতেই পারে না, অথচ আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি, একের অন্যের বিচ্ছেদে আমাদের জীবন হবে বীড়ম্বনামাত্র—তাই —চল পালিয়ে যাই কোন দূর দেশে যেখানে আমরা থাকবো দুজনে একটী ঘর বেঁধে। সত্যি তুমি আপত্তি করো না। আর তোমার বাবা যেমন উঠে পড়ে লেগেছেন তোমার বিবাহ

দেবার জন্য, তা'তে মনে হয় এই মাসেই বিবাহ দেবেন ঠিক করেছেন। বীণা প্রশ্নকরে—কোথায় তাহলে পালিয়ে যাবে?

—সে তখন পথে গিয়ে পথের সন্ধান করে নেওয়া যাবে।

—কিন্তু পথের খরচা কিছু চাই ত, তার কি করবে?

—সে ভাবনা তোমার ভাব্‌তে হবে না বীণা, সে আমি সব ঠিক করে নেবো। তুমি শুধু যাবে আমার পাশে। কোন কিছুর ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে দেব না।

এমন সময় বীণার মা এসে পড়েন সেখানে, বলেন—এই যে বাবা গোবর্দ্ধন, তুমি কতক্ষণ এসেছ?—'কি কিছুই ভাবতে দেবে না' বীণাকে? আবার বুঝি তোমাদের তর্ক সুরু হয়েছে? নাঃ, তোমাদের নিয়ে আর পারলাম না। কি যে তোমাদের তর্ক আর তর্ক, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। কোথায় বিলেতে কবে কোন সালে কোন মহৎ লোক জন্মেছিল তাই নিয়ে তোমাদের সেদিন যা তর্ক! আমি রান্নাঘর থেকে ভাবলাম বুঝি বা তোমাদের মারামারি না বাধে। তা যাক, জান বাবা গোবর্দ্ধন, মা বীণার আমার বিয়ের একরকম ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলেছেন তোমার কাকাবাবু। বীণা বুঝি সে সব কথা তোমায় কিছু বলেনি? আজ আর একটু পরেই তারা আশীর্ব্বাদ করতে আসবে। —এবার তিনি মেয়ের দিকে ফিরে—দেখদেখি এখনও পর্য্যন্ত মেয়ের গা ধোয়া, সাজবার নামটী নেই। আবার গোবর্দ্ধনের দিকে ফিরে—তুমি বাবা যখন এসেছ তখন খুব

ভালই হয়েছে, খাটা খাটুনির দিকে, তোমার কাকাবাবুর অনেক উপকার হবে'খন।

গোবর্দ্ধনকে তখন বলতে শোনা যায়—হাঁ, শুনলাম বীণার বিয়ে, সেই কথাই ত হচ্ছিল। আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি বীণাকে—কি রঙের শাড়ী ওকে খুব ভাল মানায়, আর কি রঙের শাড়ী ও পরতে ভালবাসে।—নাও, বল বীণা?—তোমায় কিন্তু ভাবতে মোটেই সময় দেব না। বল, বল চট্ করে?

বীণা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল, তার মুখ দিয়ে এলো—না, আমি যেতে পারবো না।

বীণার মা তখন বলে উঠ্লেন—না যাবিনা কি, আর একটু পরেই ওরা আসবে। নে, নে, তুই গা ধুয়ে এসে সেজেগুজে নে, তারপর বীণার মা এগিয়ে গেলেন মনে মনে বল্‌তে বল্‌তে—দেখি ঠাকুররা রান্নাবান্নার কতদূর কি করেছে।

এবার বীণা গোবর্দ্ধনের কাছে এসে বল্‌লে—গোবর্দ্ধনদা, আমার ভালবাসার বিনিময়ে একটা অনুরোধ রাখবেন? না, না, তোমায় আমার এ অনুরোধ রাখতেই হবে। বল, বল রাখ্‌বে?

দেখা গেল বীণার দুটী চোখ ভরে এসেছিল জলে। সে কাঁপছে দেখে পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি তাকে তার বুকের কাছটাতে করে নিয়ে বল্‌লে—বল। বীণা গোবর্দ্ধনের বুকে মাথাটা রেখে যেন কিছু সাহস পেলে, কিন্তু চোখের জল তখনও চলেছে বয়ে তার অবাধে। গোবর্দ্ধনেরও

চোখের জলে ভিজ্‌ছিল বীণার মাথার চুল। এই ভাবে কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব থাকার পর বীণাকে বল্‌তে শোনা গেল—গোবর্দ্ধনদা, তুমি সব ভুলে যাবে বল, তুমি কোন দুঃখ করবে না বলো। তারপর চলে আবার তাদের কান্নার পালা। আবার বীণা বলে—জানি তুমি খুব কষ্ট পাবে। কিন্তু কি করবো? তবু তুমি আমায় ভুলে যাও। তুমি আমার এ বিয়েতে মত দাও গোবর্দ্ধনদা—আবার কান্না। এবার গোবর্দ্ধন বীণাকে তার বুকে আরও জোরে চেপে কান্নার সুরে বলে ওঠে,—ভুল্‌তে আমি কিছুতেই পারবো না। তবে তুমি বিয়ে করে সুখী হও বীণা। তুমি জান না তোমার দেওয়া ফটোখানা কত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। তোমার প্রেমের মূর্ত্তি আমি অন্তরে এঁকে রেখেছি চিরদিনের তরে। তুমি দূরে চলে গেলেও সে মূর্ত্তি মুছ্‌তে পারে না। গোবর্দ্ধন আর কিছু না বলতে পেরে ফুঁপিয়ে ওঠে কেঁদে। এবার বীণা বলে—তুমি কাকেও বলো না আমাদের এই প্রেমের কথা, আমরা উভয়ে জান্‌বো গত জীবনটা আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম।

গোবর্দ্ধন কান্নার সুরে বলে—না, না, সে স্বপ্ন হলেও বীণা আমি ভুল্‌তে পারবো না তা'? বীণা বলে এবার—আমিও কি ভুলতে পারবো? না, না, পারবো না। কিন্তু কি করবো? বিবাহ যে না করেও উপায় নেই। মনে আমার রয়েছে কতদিন নির্জ্জনে বসে কত গল্প করেছি, কত গান গেয়েছি, কত ফুল

দিয়ে সাজিয়ে দেছ তুমি আমার কবরী, আমিও মালা গেঁথে পরিয়ে দেছি তোমার গলায়। আমি তোমায় প্রাণ ভরে ভালবেসেছি, আরও ভালবাসতে চাই—কিন্তু—

তারপর চলে ফুঁপিয়ে কান্নার মধ্য দিয়ে তাদের সময়ের মুহূর্ত্তগুলি, এমনসময় আবার ডাক পড়ে রান্নাবাড়ীর ভেতর থেকে—বীণা, মা আমার, গা ধুয়ে তাড়াতাড়ি সেজে নে।

এই ব্যাপারের তিন দিন পরে বেশ ঘটা করে বিয়ে হয়ে যায় শ্রীমতী বীণা দেবীর এম্ এ পাশ বজ্র ভাদুড়ীর সঙ্গে। বীণাদেবীর বর দেখে অনেক কুমারী মেয়েই ঠিক করেছিল—বিয়ে যদি করতেই হয় ত ঐ রকম বর বিয়ে করা উচিৎ। যেমন চোখ, মুখ, নাক, তেমনি গায়ের রং। ঠোঁটের হাসি থেকে চলার ভঙ্গিমাটী পর্য্যন্ত বেশ মন ভোলানোর কৌশলে পূর্ণ। শুভদৃষ্টির সময় বীণা বজ্রের মুখ থেকে পারেনি সরিয়ে নিতে অন্য দিকে তা'র চোখের দৃষ্টি। তারপর যতদূর জানা যায় বীণা বিবাহের পর গোবর্দ্ধনবাবুর সঙ্গে মোটেই দেখা করেনি আর। আর তার স্বামী দেবতাটীকে কিছুক্ষণ না দেখতে পেলেই তার মধ্যে আসে এক অস্বস্তির ভাব। কাজেই সময় তার কাটে স্বামী দেবতাটীকে চোখে চোখে রেখে।

গোবর্দ্ধন এখন রাজনৈতিক জগতের একজন বড় নেতা। দেশের মুক্তিচিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তার কাছে মহাপাপ। সব সময়ই তাকে চিন্তা করতে হয়—জনসভায় বক্তৃতার আরও

অনেক বড় বড় বিষয়ের দেশমাতার মুক্তির জন্য। তার মা তাকে কতবার বলেছেন—বাবা, বিয়েথা কর, একটা টুকটুকে বৌ এনে সংসারে মন দে। কিযে সুরু করেছিস, তার পরিনাম ভাবতে গেলে ভয়ে আমার বুক ওঠে কেঁপে। উত্তর আসে—তুমি বোঝ না মা, পরাধীনের বিয়ে করা মহাপাপ। এরপর মা কি আর ছেলেকে পাপ করতে বলতে পারেন? কাজেই চুপ করে চলে যেতে হয় অন্যত্র।

এদিকে বছর চার পরে একদিন বজ্র চলেছে তার স্ত্রীর শরীর খারাপ হওয়ার দরুণ হাওয়া বদলাতে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে পুরীর পথে। গাড়ীখানা যখন হাওড়াষ্টেশন ছাড়ে তখন ভীড় ছিল গাড়ীতে ভীষণ, পাশের লোকেরই মুখ দেখ্‌বার সময় ছিল না নিজের স্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকায়। গাড়ীখানি চলতে সুরু করে। তিন চারটা ষ্টেশনে একটু একটু থেমে কিছু যাত্রী নামিয়ে দিয়ে চল্‌তে সুরু করেছিল যখন তখন দেখা গেল—গাড়ীখানির কামরার একটী কোণে বজ্র তার বড় ছেলেটীকে কোলে নিয়ে জান্‌লার মধ্য দিয়ে দেখ্‌ছিল প্রশস্ত মাঠ আর নীল আকাশ,—আর বীণাদেবী ঘুমন্ত ছোট ছেলেটীকে কোলে নিয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিল ছেলেটীর মুখের দিকে। হঠাৎ ছেলেটী ওঠে চীৎকার করে কেঁদে, হয়ত কোন দুঃস্বপ্ন দেখে, তাই তাড়াতাড়ি বীণা দেবী ছেলেটীকে বুকের কাছে চেপে নিয়ে ভোলাতে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলেটির আকস্মিক

চীৎকারে গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীদেরও দৃষ্টি পড়ে সেই দিকে।

সেই একই কামরার অপরদিকে বসেছিল রাজবন্দী অবস্থায় দু'জন সিপাহীর সঙ্গে গোবর্দ্ধন। সেও চলেছে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে মেদিনীপুর জেলে বদ্‌লি হয়ে। ছেলেটীর কান্নায় তারও দৃষ্টি গিয়েছিল সেইদিকে, তারপরেই তার প্রত্যেক শিরার মধ্যে প্রবাহ হয়েছিল শিহরণ। সে মনে মনে উঠেছিল চম্‌কে, মনের মধ্যে এসেছিল ভীষণ চাঞ্চল্য।

তারপর আবার সেই যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্। দিন যায়, মাস যায়, বছরও কেটে গেল। আরও দু'টী বছর পরের কথা। এখন গোবর্দ্ধন সার বুঝেছে দেশের মুক্তি ফিরে পেতে গেলে চাই পুরুষ ও নারীর সমবেত সাধনা। তাই তার মায়ের কথামত আজ সে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে পানিহাটীর জমিদার অমৃতলাল বসু মহাশয়ের কন্যা গৌরীকে। বয়স একটু বেশী হলেও পরমা সুন্দরী। বিয়ের পর গোবর্দ্ধন যখন বাসরে গিয়ে বসেছে, তখন পাড়ার অনেক বৌ—ঝিই এসেছে নূতন বরের সঙ্গে একটু ঠাট্টা তামাসা করবার আশায়। পাশের বাড়ীর ভাদুড়ীদের বৌ বীণা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল নিজের কচি ছেলেটীকে নিয়ে, এবার এগিয়ে এসে গৌরীকে বল্‌লে—সই, এখনও তোর বর দেখিনি, কই তোর বর দেখি। তারপর বরের সাম্‌নাসাম্‌নি হতেই তার মুখের সমস্ত রক্ত নিমেষে যেন কোথায় চলে গেল। মুখের বর্ণ সাদা কাগজের মত, তবু সহসা তার মুখ দিয়ে এলো —গোবর্দ্ধনদা—!

—আটাশ—

জীবনের গতি

গোবর্দ্ধনও কতকটা হতভম্বের মত হয়ে পড়েছিল। তবে জীবনে তার অনেক কিছুই ঘটে গেছে, তাই সামলে নিয়ে বললে —বীণা! তোমার শ্বশুর বাড়ী বুঝি এই কাছেই? বিয়ের পর আর মোটেই বাপের বাড়ী গেলে না! সত্যি, কাকাবাবু কাকীমা কত দুঃখ করেন—তোমার না যাওয়ার জন্য।

তারপর উৎসব রাত্রি শানাইয়ের সুরে আর আনন্দের কোলাহলে প্রভাত হলো। গোবর্দ্ধন তার নব পরিণীতা বৌ নিয়ে সুখী, আর বীণা তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই কখন কি ঘটবে, আর কার কি ঘটবে তা না ভাবাই ভাল—কারণ জীবনের গতি বড় অদ্ভুত।

—শেষ—

"রাত্রি বারোটা"

(নক্সা)

বিমল তার ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে পড়তে সুরু করে। সে ভেবেছিল হয়ত চিঠিখানা এসেছে মলিনার কাছ থেকে। আসলে চিঠিখানা ছিল এক পত্রিকা-সম্পাদকের, জরুরী হুকুম একটী লেখা দেবার—লেখা আবার যেমন তেমন নয়—একাঙ্ক নাটিকা।

চিঠিখানা এক পাশে রেখে বিমল তুলে নিলে তার খাতা আর পেন্‌সিল। সুরু করলে ছক কাটতে তার নাটকের, ছক কাটা যখন শেষ হল তখন মুস্কিল হ'ল তার নায়ক আর নায়িকার নাম নিয়ে—কিছুতেই আর ভাল নাম তার মনে পড়ে না। বেজায় বিরক্তি এল তার নিজের ওপর। হঠাৎ সে দেওয়ালের ওপর বড় ক্লক ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে—রাত্রি বারোটা। না আর ত দেরী করা চলে না। নাম সে ঠিক করলে শেষে 'সুকুমার'।

সুকুমার তাড়াতাড়ি করলে ত আর সময় তাড়াতাড়ি যাবে না, কি তার বাড়ীটাও এগিয়ে আসবে না। আফিস থেকে উঠবার সময় সে টেলিগ্রাম পেয়েছে তার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে যে তার স্ত্রীর বড় বাড়াবাড়ি অসুখ—তাকে এই রাত্রেই

যেতে হবে দেশে ফিরে। অসুখ শুনে ত আর খালি হাতে যাওয়া যায় না। মাসের শেষের দিকে হাতে পয়সাও নেই। তাই বন্ধুদের খোঁজে বেরিয়ে কিছু পয়সা ধার করে কিনে নেয় সামান্য কিছু ফল। ষ্টেশনে এসে দেখ্‌লে গাড়ি ছাড়তে অল্প সময় বাকী আছে। তাই তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কেটে সে গাড়ীর এক ছোট কামরায় একটী ভদ্রলোকের পাশে বসল—ভদ্রলোকটী হয়ত এতক্ষণ বসে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাশে সুকুমার এসে বসায় চোখ খুলে চাইলেন। পাদুটী একটু সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই, কোথায় যাবেন? সুকুমার তাঁকে জানালে—রূপসা ইষ্ট। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব থাকার পর সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে—কখন গাড়ীটা ছাড়বে? ভদ্রলোকটী বললেন—'বারোটায়'। এমন সময় গাড়ী চলতে সুরু করলে আর দূরে গীর্জ্জার ঘড়িটায় রাত্রি বারোটা জানিয়ে দিলে। সুকুমার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার সঙ্গে ত পরিচয় হলো, কিন্তু নামটা এখনও ত জানা হলো না? ভদ্রলোকটী বললেন—আমার নাম দীপক রায়।

দীপক যে কেন এত মদ খায় তা হোটেলের মালিকের জানবার দরকার করেনি কোনদিন। সে জানে দীপক বাবু শিক্ষিত যুবক আর বড়লোকের ছেলে। রোজই সন্ধ্যার সময় নিজে গাড়ী চালিয়ে আসে, আর এক বোতল মদ শেষ করে রাত্রে ফিরে যায়। রোজকের রোজ খরচের পয়সা দিয়ে মাঝে

মাঝে বয়কে বকসিস্ করেও যায়। সেদিন যথানিয়মেই দীপক মদ খাচ্ছিল, এমন সময় তার সামনের টেবিলটায় একটী ভদ্রলোক আর একটী ভদ্র মহিলা এসে বসলেন। মহিলাটী হয়ত তাঁর স্ত্রী হতে পারেন, তবে খুব যে প্রগতিশীলা আর শিক্ষিতা তা বেশ ফুটে উঠেছিল তাঁর বেশভূষায়, আর অল্প কথা যা শুনতে পাওয়া গিছলো তা'তে। ভদ্রলোকটী দীপককে দেখে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে তার কাছে এসে বললেন—কিহে দীপক তুমি! এভাবে বসে Drink করছ, একা, এতরাতে, এখানে? তা কেমন আছ? কলেজ ছাড়ার পর ত আর দেখা নেই! সত্যি তোমাকে এই রাত্রি বারোটার সময় হোটেলে দেখতে পাব তা' কোনদিনই আশা করিনি। যাক যখন দেখা হল তখন এসো পরিচয় করিয়ে দি আমার স্ত্রীর সঙ্গে। এঁর নাম অনিমা।

অনিমা শিকারের আশায় নিজের দেহটাকে বেশ সৌখিন করে সাজিয়ে সন্ধ্যা থেকে দরজার কাছে আগন্তুকের আশায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বরাতটা তার খারাপ, তাই এত রাত্রেও লোক আসেনি। আবার সে ভাবনায় পড়েছে কেমন করে কাল সকালে ঘর ভাড়া মেটাবে। কি সে বলবে তার বাড়ী-ওয়ালীকে। নাঃ, আজ রাতে তাকে কিছু রোজগার করতেই হবে,—অন্ততঃ ঘরভাড়াটা। এমন সময় একখানা রিক্সা এসে দাঁড়াল তার সামনে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রিক্সা থেকে নামিয়ে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলো,—এমনসময় ঘড়িটা

রাত্রি বারোটা

নবাগতকে অভ্যর্থনা জানালে বারোটা শব্দ করে। অনিমা লোকটার পকেট থেকে ছুটী টাকা নিয়ে কি যেন কিনে আনবার জন্য ডাকলে তাদের বারোয়ারী ঝি—লক্ষ্মীকে।

লক্ষ্মীকে আর কি দোষ দেওয়া যায়। দিন রাত আপ্রাণ সেবা করেও তার বাবাকে সে বাঁচাতে পারলে না। মরণ যখন যার হবে, সেবা, যত্ন, কোন কিছু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না কেউ। সংসারে ছিল তার বুড়ো বাপ আর একটী ছোট. ভাই। তাও তার বাবা আজ তাদের ফেলে চলে গেলেন। লক্ষ্মী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। পাড়ার দু'চারজন মেয়ে—ছেলে এসেছিল এই দুঃখের দিনে তাকে সান্ত্বনা দিতে। তাদেরই মধ্যে একজন বুড়ি বললে—কেউ সময়টা দেখে রাখ বাছা কখন মারা গেল। দোষ পায় কি না পরে দেখতে হবে। একজনের হাতে ঘড়ি ছিল, সে দেখে বললে—রাত্রি বারোটা দোষ বোধহয় একটু পাবে। এমনসময় বুড়ি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললে—আহা-হা তুই ওদিকে বাসনে, বামুনের মড়া, এক্ষুনি ছুঁয়ে ফেলবি কালোবৌ।

কালবৌয়ের যে এমন চাঁদের মত ছেলে হবে তা আর কে ভেবেছে বলো। কেউই আশা করতে পারেনি। কালোবৌয়ের শাশুড়ী চেঁচিয়ে বলে—ওরে খোকা, তাড়াতাড়ি দেখ বাবা—ক'টা বাজলো। তোর ছেলে হয়েছে রে, চাঁদের মত ছেলে। খোকা তাড়াতাড়ি তার পকেট ঘড়িটা খুলে দেখে বলে—রাত্রি বারোটা।

—তেষট্টি—

শোনা যায় পাঁচ শাঁকের ধ্বনি। তারপর খোকার মা বলে—খোকা, তোর ছেলের কি নাম রাখবি রে? এইবার দেখা গেল খোকাও মুস্কিলে পড়েছে বিমলের মত।

সুকুমার নামটাও যখন বিমলের পছন্দ হলোনা, তখন খাতা আর পেন্‌সিলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে টেনে নিল তার চিঠি লেখার প্যাড্‌টা আর কালি কলম—লিখলে সে সম্পাদকের উদ্দেশে—মশাই! যদি নাটক চান ত নাটকের নায়ক আর নায়িকার নাম উল্লেখ করে পাঠিয়ে দেবেন! ইতি—

বিমল বসু।

—শেষ—

জীবনে রবির আলো।

(বড় গল্প)

বিদায় নেবার সময় এলে আমার ছুটী চক্ষু ভরে এল জল—যদিও সাতটী দিন পরে এলাম মুক্ত বাতাসের মাঝে, মুক্ত আকাশের নীচে মুক্তি পেয়ে, তবুও মুক্তির সে আনন্দ যেন কোন সাড়া জাগাতে পারলো না আমার মনে। মনে হয়েছিল গত সাতটী দিন যদি সাতটী বছর হ'ত কিম্বা সারাজীবন যদি ঐখানে থাকতে পেতাম,—কিন্তু তা যখন হবার কোন আশাই নেই, তখন মনে আপনা থেকেই সান্ত্বনা আসতে দেহটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি নিজের হোটেলের দিকে। হঠাৎ আবার থামলাম তার ডাকে, সে এবার ছ'পা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভারি গলায় বললে—তার চোখ মুখ গলার স্বরে বেশ ধরা পড়ে গেল সেও কাঁদছে মনে মনে—

—দেখুন আপনি ত আরও কিছুদিন এখানে থাকবেন, মাঝে মাঝে বিকালে এখানে এলে দেখা হবে, যেন চলে গিয়েই ভুলে যাবেন না।

—না, না, ভুলে যাব কি বল! তোমার সেবা শুশ্রূষা

৫—

কোনদিনই ভুলবনা, আর তার ঋণ শোধ করতে পারবোনা। সত্যি তোমার সেবা যত্ন—

—সেবা যত্ন, ওটা ত আমাদের কাজ, ওরি জন্যে মাসের শেষে মাইনে দেয়। পেটের জন্য অর্থ, আর সেই অর্থের বিনিময়ে সেবা যত্ন বিক্রী, আন্তরিকতা এখানে কোথায় পাবেন ?

তারপর এগিয়ে চলেছি। আর বেশী কথা কইতে পারলাম না, পাছে বেশী কথা বলতে গেলে ধরা পড়ে যায় আমার অন্তরের কান্না। বেশ খানিকটা চলে এসে পিছু ফিরে দেখি—সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক্ সেইখানটিতেই আমার চলে আসার পথ চেয়ে। আমি আরও জোরে এগিয়ে চলতে সুরু করলাম। হোটেলে ফিরে ঘরের চাবিটি খুলে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়েই কি আর ঘুম আসে। মনের মধ্যে ভীড় করে এলো তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার স্মৃতি, আরও অনেক কথা। তার করুণ দুঃখ-ভরা জীবনের অতীতের মর্ম্মান্তিক ঘটনাগুলি আমার মনের মধ্যে ভিড় করে এসে আমাকে দুঃখে অভিভূত করে ফেললে— দু'চোখ ছাপিয়ে এলো শুধু জল। এমনসময় আমার পাশের ঘরের অনিলবাবু এসে আমার ঘরের বাতিটা জেলে দিলেন, আমায় বললেন—কি, কাশীবাবু,

কেমন আছেন? দেখুনদিকি! কি ফ্যাসাদ! সবই গ্রহের ফল! বরাত, মশাই বরাত!

অবাক হলাম, এই মনে করে যে এই সাতটা দিনের মধ্যে ভদ্রলোকের কোন বিপদআপদ ঘটলো নাকি। বিপদের দিনে বিপদটা কি অনুসন্ধান করাটা কেমন যেন অভদ্রতা বলে মনে হয়, তবুও জিজ্ঞাসা করলাম—কি মশাই, আপনি আবার কি ফ্যাসাদে পড়লেন? বরাতের দোষে আপনার আবার কি বিপদ ঘটলো? অনিলবাবু বললেন—এসব বরাত ছাড়া কি বলতে চান মশাই? কোথায় মাসখানেকের জন্য পাটনায় এসেছেন বেড়াতে—দিব্যি ভাল মানুষটা, সেজেগুজে বেরুলেন বেড়াতে, তারপর কোথায় সাদা রাস্তায় এমন হোঁচট খেয়ে পড়লেন যে হাত ভেঙে দাঁত ভেঙে সাতটা দিন হাসপাতাল বাস!

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বুঝলাম ফ্যাসাদটা অনিলবাবুর নয়—আমারই বিপদে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মনে মনে হাসিও এলো, মুখে বল্লাম—সত্যিই ফ্যাসাদ। অনিলবাবু আবার শুরু করলেন,—যাক্, এখন বেশ সেরে এসেছেনতো? হাতের ব্যাণ্ডেজ দেখ্ছি এখনও বাঁধা রয়েছে। হাঁ, একটা কথা, আপনি আজ এসেছেন বড় ভালই হয়েছে। কাল জানেন্ কাশীবাবু, ৬ই অগ্রহায়ণ, আমার জীবনের বড় স্মরণীয় দিন। যদিও এটা ১৩৫৬

সাল, তবুও এই দিনটী আমার বড ভাল লাগে। কেন জানেন ? ঐ দিনটাতে আমার বিবাহ হয়। আজ প্রায় ছ'টী বৎসর আগে। তাই আপনাকে আর এখানে দুই একজন বন্ধু বান্ধবকে নিযে একটু আনন্দ করা যাবে। যদিও আপনার সঙ্গে আলাপ অল্পদিনের তবু কেমন যেন আপনাকে বড ভাল লাগ্‌ছে। যাই হোক আমি এখন উঠি, রাত্রি হলো, ঘুমোন। কাল সকালে উঠে ডাক্‌বো কিন্তু, একসঙ্গে বাজারে যাওয়া যাবে।

—ওঃ, সে ত বড ভাল কথা। নিশ্চয় উঠ বো কাল সকালে ভোজের আয়োজন কবতে। কাল তাহলে ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ঐ তারিখে আপনাব বিবাহ হয়েছিল ? বেশ। তা'হলে সকালে ডাকবেন।

তাবপর অনিলবাবু উঠে গেলেন নিজের ঘরের দিকে, আমি রইলাম নিদ্রাদেবীর আরাধনায়। নানান চিন্তায মন ছিল ভবা, জানিনা কখন ঘুমিযে পডেছিলাম।

*   *   *   *

সকালে ঘুম ভাঙ্গল একটী ধাক্কায়।

—কিহে। খুব আরামে ঘুমোচ্ছ ! আজ ৬ই অগ্রহায়ণ, খেয়াল আছে ? ওঠো, ওঠো, বাজার যেতে হবে না ? সে হুঁস তোমার নেই দেখছি। ওদিকে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, তারা ত আর একটু পরের থেকেই আসতে সুরু করবে।

আমি বল্‌লাম—আরে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সকালে চায়ের ব্যবস্থা ত করা আছে, তার পরেই ত তারা খেতে বসবে না, খেতে ত সেই বারোটা কি একটা হবে। যথেষ্ট সময় আছে, ব্যস্ত হবার কোন কারণ দেখি না।

তুমি ত বল্‌বেই ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই, কিন্তু কিনে আনলেই ত আর রান্না হয়ে যাবে না। রান্না করতে আবার সময় লাগবে।

আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি। একটা সিগারেট দাও তো। আর হাঁ, তোমার বোন্ শেফালীর বন্ধু শ্রীলেখাদেবী আস্‌ছেন ত তোমার জন্ম তিথির নিমন্ত্রণে? —আস্‌ছেন মানে! শ্রীলেখা ত এসেছে দেখে এলাম।

—শুধু এসেছে নয়, আমার জন্ম দিনের উপহার পর্য্যন্তও দেওয়া হয়ে গেছে। কি উপহার দিয়েছে জানিস্ কাশী? তার হাতের বোনা চমৎকার একটা ছুঁচের কাজ বাঁধিয়ে, তাতে লেখা আছে—

"কানুদা'র জন্মদিনে
দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা।"

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সাল—শ্রীলেখা।

তারপর সারাদিন কেটে গেল হৈ, হৈ করে নানান্ খাটুনির মধ্য দিয়ে। রাত্রি তখন হবে ন'টা, নিমন্ত্রিতেরা সবাই চলে গেছে। বিশ্রামের আশায় কানুদের বাড়ীর একটী নির্জ্জন ঘরে শুয়ে আছি।

এমনসময় হঠাৎ ঘরের আলো উঠলো জ্বলে, চোখ খুলে দেখি সামনেই শ্রীলেখা, বললাম—কি শ্রীলেখা, খুব খাট্‌নি হয়েছে, নয় কি? তা এবার বাড়ী যাচ্ছ বুঝি। হাঁ তোমার উপহারটা দেখ্‌লাম, সত্যি, ভারি চমৎকার ছুঁচের কাজ জান ত!

—কি আর এমন ভাল কাজ দেখ্‌লেন। আপনার যেমন স্বভাব, সব কিছুই ভাল চোখে দেখেন।

—বাঃ, এ বড় মুস্কিল, ভাল যেটা চোখে লাগবে সেটাকেও ভাল বলব না, মন্দ বলবো! সে বললে—তা কেন, তাকি আমি বলছি নাকি। আচ্ছা সে কথা থাক। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, গোপনীয় খুব।

এবার সে একটু থাম্‌লো দৃষ্টিটাকে মেঝের ওপর রেখে মাথা নীচু করে। 'খুব গোপনীয়', এই কথাটায় আমিও হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম। আমার সঙ্গে তার গোপনীয় কথা! অধীর হয়ে পড়লাম কি এমন কথা থাকতে পারে—যা খুব গোপনীয়। না, না, তা থাকতে পারে বই কি। যার জীবন রহস্যে ভরা তার ত গোপন কথা থাকতেই পারে। এই সেদিনই তার জীবনের এক গূঢ় রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে—যেদিন তাকে বিয়ে করতে এসে বর ফিরে গেল বরণের পিঁড়ি থেকে। কিন্তু আমার সঙ্গে কেন? ওকি বুঝতে পেরেছে আমি ওকে মনে মনে ভালবাসি। ওর ব্যবহার, ওর কথা, ওর প্রত্যেক কাজটী আমার কত ভাল লাগে। না—না! তা

কেমন করে হবে? আমার মনের কথা আমি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানে না। না জানি কি গোপন কথা ও বলতে চায়! ওকি বলতে চায়—চল পালিয়ে যাই তোমাতে আমাতে কোন দূর দেশে,—না কি ও আমার মনে মনে ভালবেসেছে—তাই আজ নির্জনে জানাতে চায়। তবু সাহসে ভর করে বল্‌লাম—শুধু গোপনীয় নয়, খুব গোপনীয়? বেশ বল, আমি প্রস্তুত।

—না গোপনীয় মোটেই নয়, ভুল বলেছি—তবে বড় প্রয়োজনীয়। জানেন বোধ হয়, বাবার ব্যবসা ফেল করেছে? আর আমাদের এমন সংস্থান নেই যে, কোন রকমে দিন চলে। বাবার ক'দিন থেকে মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তারপর কাল তিনি যে কোথায় গেছেন—কেউ কোন খোঁজ দিতে পাচ্ছে না। এই সংসারে আমার নিজের বলতে আমার বাবা ছাড়া ত আর কেউ নেই। সৎ-মা তাঁর ছেলেদের নিয়ে চলে গেছেন তাঁর ভাই-এর বাড়ী।

কিছুক্ষণ চুপ করে, থাকবার পর,—হাঁ, প্রয়োজনীয় কথাটা হচ্ছে, একটা কাজ করে দিতে পারেন?

আমি বল্‌লাম—তোমার দ্বারা কি এমন কাজ করা সম্ভব?

—কেন একটু আগেই ত আমার ছুঁচের কাজের তারিফ করছিলেন, সেই ছুঁচের কাজ শেখাব। অল্প লেখাপড়া যা জানি তা' শেখাব, গান শেখাতে পারি, কোন ভদ্র পরিবারে দুবেলা দুমুঠো খেতে পেলেই রাজি। এখন বেশী কিছুও মাইনে চাইছি না।

—আচ্ছা, তা' হলে চেষ্টা করবো।

—না-না চেষ্টা করবো ও কথা শুনছি না। আমাকে একটা কাজ করে দিতেই হবে।

—বেশ, এখনি কি বাড়ী যাচ্ছ ?

হ্যাঁ—এদিকে ত সব একরকম মিটে গেছে, এবাব গেলেই হয়।

—আচ্ছা চল, আমিও উঠি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাব।

—বেশত ; সে খুব ভাল কথা, কিন্তু আমাব সঙ্গে এতটা রাস্তা যাবেন পথে যদি কেউ দেখে, বদনাম রটাতে পারে।

সে ভয়ত তোমারও হতে পারে—

কিন্তু যারা বদনাম রটাবে তারাত আপনার নাম নিয়ে আমার বদনাম রটাবে না, তারা আমার নাম দিয়ে বদনাম ঘোষনা করবে।

এবার দেখ্‌লাম তার চোখ দুটী ভরে এসেছে জলে, কাজেই কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লাম—বাড়ী ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

রাত্রে অন্ধকার পথের বুকে চলেছি আমি আর শ্রীলেখা যখন তাদের বাড়ীর সামনাসামনি এসেছি, নিজের অজানিতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—শ্রীলেখা! তুমি বুঝি কোন-বদনামেরই ভয় কর না ?

—মিথ্যা বদনামের কোন মূল্য আছে কি? সে এত গম্ভীরভাবে কথাটা বললে, যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল—সত্যি সে

কোন বদনামের পাত্র নয়। মন তার খুবই পবিত্র—চরিত্র তার নির্ম্মল—সাহস আছে তার বুকভরা। বুঝলাম যারা তার বদনাম রটায় তারা তার ক্ষমার পাত্র, বললাম—তাহলে শ্রীলেখা আজ রাত্রিটা তোমার এখানে থেকে গেলে কেমন হয়।

—সে ত আমার সৌভাগ্য। আসুন না। সত্যিই আপনার যথেষ্ট খাটুনি হয়েছে। আর বাড়ী ফিরতে এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে। রাত্রিটা বইত নয়।

—তাই চল।

শ্রীলেখা এগিয়ে চলে, তার পিছনে চলেছি আমি। সে একখানা ঘরে ঢুকে দেওয়ালের গায়ের আলোটা জ্বেলে একখানা মাদুর পেতে দিয়ে বসতে বলে তাড়াতাড়ি বিছানাটা পরিস্কার করে দিয়ে আমার সামনে এসে বললে—নিন্ এবারে শুয়ে পড়ুন। আমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম! সে তখন চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম—শ্রীলেখা, শোন!

সে তখন ফিরে এসে নীরবে দাঁড়াল আমার সামনে। বললাম—বসো, আমার বিছানার একটা পাশ দেখিয়ে দিলাম। সে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বস্‌লো। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব থাকার পর ধীরে ধীরে তার একখানি হাত আমার হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললাম—"শ্রী!" তুমি বদনামকে ভয় কর না কেন? তোমার চোখেমুখে ফুটে রয়েছে অতীতদিনের দুঃখের ছায়া কেন বল ত!

—ক্রিয়াম্ভর—

সে বুঝি কেঁদে ফেলেছে তার এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে এসে পড়েছিল আমার হাতে। এবার সে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বল্‌লে—এই পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে সুখ, দুঃখ দুই নিয়েই থাকতে হয়! শুধু দুঃখটাকে বড় করে দেখ্‌লে চলে না—বা সুখটাকে বড় করে দেখ্‌লেই হয় না। আর বর্ত্তমানে তাকে মনে করে রেখে লাভ কি?

—শ্রীলেখা! যদি আমার জীবনের সব কিছুর বিনিময়ে তোমার জীবনে এতটুকু সুখ বা শান্তি এনে দিতে পারি, তা'তে তুমি বাধা দেবে না বল?

—আচ্ছা, কাশীবাবু! আপনি হঠাৎ আমার জীবনের সুখ, দুঃখ নিয়ে জীবনের রহস্য জান্‌তে এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? সময়ে সব রহস্যই জান্‌তে পারবেন। এই ত সেদিন আমার বিয়ের বর এসে ফিরে গেল বাসর থেকে। পাড়ার লোকের কাছে—সর্ব্বসাধারণের কাছে আমার জীবনের এক রহস্য প্রকাশ হয়ে গেল। সে সব খবর বুঝি আপনি কিছুই পাননি? বেশ লোক যাহোক আপনি! এ পাড়া দিয়ে কতবার যাতায়াত করছেন অথচ এমন একটা সুন্দর খবর—তাছাড়া পাড়ার লোকগুলিও বা কেমন বুঝি না! তাদের ওপর চেনা-অচেনা সকলকেই জানাবার ভার দেওয়া রয়েছে! আর এইত তাদের সারাদিনের কাজ। পরের বাড়ীর খবরে তারা বড়ই সচেতন।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—কি অদ্ভুত এর প্রকৃতি! লজ্জা, ঘৃণা কোন কিছুরই কি ভয় ওর নেই! ডাক্‌লাম—শ্রীলেখা!

আমার এই ডাকে সে যেন চমকে উঠল। বললাম—শ্রীরেখা! সকলকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু যায় না এই ভাবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। আচ্ছা, সত্যি তোমার বিয়েতে ঐরকম গোলমাল হয়েছিল কেন বলত?

সে এবার উদাস চোখে চেয়ে একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে বলতে সুরু করলে,— শুনুন তবে—বয়স যখন হবে ছ' বছর, মাসীকেই জানতাম্ মা বলে, সেই সময় হঠাৎ একদিন এলেন বাবা, সেই প্রথম পরিচয় হলো বাবার সঙ্গে জ্ঞান হবার পরে। মাসীর সংসারে আমি আর মাসী ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাবা চার পাঁচ দিন থেকেই আমায় তাঁর সঞ্চিত পিতৃস্নেহে একান্ত আপনার করে মাসীর কাছে প্রস্তাব করলেন আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসবার। সেই প্রথম এলাম এই বাড়ীতে। আসবার আগের দিন মাসীর কাছে জানলাম তিনি আমাব মা নন্ মায়ের বোন-মাসী। মা মারা গেছেন—আমায় ছ' মাসের রেখে। বাবার সঙ্গে এবাড়ীতে আসার কিছুদিন পরে বাবা একদিন আমায় নিয়ে গেলেন আর এক জায়গায়। জায়গাটার নাম আমার মনে নেই। সেখানে নিয়ে গেলেন আমার বিয়ের জন্য। বিয়ে হয় একটা ষাট বছর কি তারও বেশী বয়সের বুড়োর সঙ্গে। বিয়ের পর ফিরে আসি মাথায় সিঁদুর, গায়ে গয়না, হাতে বিয়ের শাঁখা।

তারপর হঠাৎ একদিন সকালে মাসী এসে হাজির। অনেক দিনের পর মাসীকে দেখে প্রাণটা আমার নেচে উঠেছিল যে কি আনন্দে তা আজও মনে হলে সত্যি আনন্দ হয়। কিন্তু তখন বুঝিনি কিসের জন্যে মাসীর সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হয়ে গেলো। মাসী আমার ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁর বাড়ীতে সেখানে নিয়ে গিয়ে মাসী আমার মাথার সিঁদুর মুছিয়ে দিয়ে, গায়ের গয়না খুলে নিয়ে, হাতের শাঁখা দিলেন ভেঙ্গে। আমার মন তখন সত্যি ভরে গিয়েছিল বিষাদে আর দুঃখে। তারপর একটী একটী করে কত বৎসর কেটে গেছে—মাসীর গলা জড়িয়ে ধরে কতদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মাসী! বাবা আর আসেন না কেন? কবে আসবেন? মাসী তখন আমায় তাঁর বুকে চেপে ধরে চোখের জলে কিছুই বলতে পারেন নি। হয়ত তাঁর বলবারও কিছু ছিল না। এই ভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল। শেষে একদিন আমার বসন্তরোগ দেখা দিল। প্রাণ নিয়ে হলো সমস্যা। মাসী আমায় সারারাত কোলে করে তাঁর যত্ন ও শুশ্রূষায়, আর দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আমায় বাঁচিয়ে তুলে সেই রোগের বিনিময়ে দিলেন নিজের প্রাণ। পাড়ার লোকেরা বাবাকে খবর দিয়ে নিয়ে এলো। সেখানে সব চিহ্ন শেষ করে এলাম দ্বিতীয় বার এ বাড়ী বাবার সঙ্গে। এবার এসে দেখলাম নূতন একজনকে। বাবাই বলে দিলেন—শ্রীলেখা! তোমার মা, প্রণাম কর! প্রণাম করলাম। মাকে বল্লেন এই তোমার

—ছিয়াশি—

মেয়ে শ্রীলেখা। মাকে প্রণাম করে অপেক্ষায় ছিলাম—আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে পেলাম কি জানেন? মা বললেন—কি বিশ্রী চেহারা! চোখ ট্যারা, বিশেষ করে মুখের দিকে চাইলে ভয় করে। বাবা তবু বললেন—বসন্ত হয়েছিল কিছুদিন আগে তাই দাগগুলো রয়েছে। ও দাগ ক্রমেই মিলিয়ে যাবে। আমিও মনে মনে ভেবেছিলাম হয়ত দাগ মিলিয়ে যাবে। এর পরে নানা লাঞ্ছনার মধ্যে দিন কেটে গেছে। এবার একটু থেমে হঠাৎ সে বলে উঠল—ভোর হয়ে এল। দেখুন ত কি অন্যায়।

আমি বললাম—ভালই করেছ, জীবনে কত যে রাত্রি ঘুমিয়েছি আর কত যে রাত্রি ঘুমিয়ে কাটাতে হবে তার কোন হিসেবই নেই। তবু একটা হিসেব থাকবে—আর তা ছাড়া কেমন করেই বা তোমাকে বোঝাতাম যে রাত্রের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে রবির আলো ধরায় আসবেই।

—আপনি বুঝি বলতে চান, আমার এই আঁধার জীবনে একদিন রবির আলো আসবেই। তা বেশ এখন আপনি একটু চুপ করে ঘুমোন দেখি।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন হবে বেলা ন'টা। বিছানায় উঠে বসেছি এমন সময় অনিলবাবু এসে বললেন—কি মশাই! খুব বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছেন। এদিকে হাসপাতালের পিওন এসে আপনার একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। হাসপাতালের বড় দিদিমণি দিয়েছেন। সত্যি কাশীবাবু আমাদের এই দিদিমণিটি মানুষ নন্ হয়ত দেবী। কিম্বা তার চাইতেও বড়

কিছু হবেন। সেবাই সত্যি তিনি জীবনের ব্রত করেছেন। শুধু হাসপাতালে নয় এই সহরের যে কোন অঞ্চলে যে কোন লোকের সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন জানতে পারলেই তিনি ছুটে যান উপযাচক হয়ে সেবা করতে। এই সহরের সকলেই তাঁকে চেনে। সবাই তাঁকে ভক্তি করে।

—সে ত, সাক্ষাৎ প্রমাণ সাত দিন হাসপাতালে থেকেই পেয়ে এসেছি। কই চিঠিখানা দেখি। এই নিন্ বলে চিঠিখানা অনিলবাবু আমার হাতে দিয়ে চলে গেলেন। আমি চিঠিখানা খুলে দেখি— ৬ই অগ্রহায়ণ,

বন্ধু ! ১৩৪৬ সাল

আজ আমি আমার জীবনে রবির আলো পেয়েছি। মনে আছে, একদিন আপনি বলেছিলেন রাত্রের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করেও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে রবির আলো ? আপনি আমায় হাসপাতালে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন না ? আচ্ছা ! এবারে বল্‌ছি—কি করে আজ আমি রবির আলো পেয়েছি। মনে আছে যেদিন আপনি সারারাত আমার সঙ্গে গল্পকরে আমার জীবনের রহস্য জেনে চলে যান ? তখন আমাদের সংসারে ছিলাম আমি একা। আপনি বলেছিলেন মাঝে মাঝে আসবেন। জানিনা এসেছিলেন কি না আমার খোঁজে। তবে আমি চলে আসার দিন পেয়েছিলাম আপনার একখানা চিঠি। বাড়ীখানা নীলাম হয়ে যায় যেদিন বাবার ঋণের দায়ে, হয়ত অনাথালয়েও থাকতে পারতাম ঐখানে কিন্তু আপনার

চিঠি ফিরে এলো ডাকিয়ে। কেন জানেন? সত্যি আমিও আপনাকে মনে মনে বড় ভালবেসেছিলাম আর ভক্তিও করতাম। কাজেই পারলাম না আপনাকে টেনে আনতে আমার জীবনের অন্ধকার পথে। তারপর যেদিন আপনি চিঠিতে জানালেন, আপনার সমাজ সম্মান সব কিছুর বিনিময়ে চান আমাকে জীবনে সুখী করতে, সেদিন আপনার ভালবাসায় শুধু কেঁদেছি। পারিনি তাকে তুলে নিতে বুকে। চাইনি সমাজের সম্মানের পথে দাঁড়িয়ে আমার জীবনের সুখ শান্তি তাই চলে এসেছিলাম পথে নিরুদ্দেশে। পথে এসে পেলাম এই পথ। এই পথে আজ আমি সুখী। ইতি—"শ্রীলেখা"

চিঠিখানা একনিঃশ্বাসে শেষ করে বুঝলাম যে শ্রীলেখা আজ সুখী—তারপর সারাদিন অনিলবাবুর বিবাহ দিবস উপলক্ষে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হাসি তামাসার মধ্য দিয়ে দিন গেল কেটে। রাত্রে নিজের ঘরটাতে এসে শুয়েছি। কতক্ষণ যে শুয়ে আছি জানি না, কি করছি তাও জানি না, কি ভাবছি তাও জানি না। এই ভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বিছানায় উঠে বসে কাগজ আর কলম নিয়ে লিখ্‌লাম—

স্নেহের "শ্রী", ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

আজও তোমায় "শ্রী"বলেই চিঠি দিচ্ছি—যদিও তুমি আজ হাসপাতালের বড় দিদিমণি, তা হলেও আমি জানি তুমি আমার কাছ থেকে "শ্রী" এই ডাকেরই আশা কর। তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলাম, কি করে তুমি আজ সকলের কাছে সেবিকা

মেয়ে পৃথিবীতে স্বর্গের ভক্তি ভালবাসা পেয়েছ। তুমি জীবনের দুঃখের বিনিময়ে আজ যা পেয়েছ তার মূল্য অনেক। একবার তুমি আমি পাটনায় এসেছিলাম? শুধু পাটনা কেন? কত দেশ, দেশ ঘুরেছি—শুধু খুঁজেছি, আজ তা পেয়েছি। কিন্তু পেয়েও নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে মন চায় না তাই কাল সকালে যখন তুমি চিঠি পাবে তখন চলে যাব এখান থেকে অনেক দূরে। কাজেই দেখা করা আর সম্ভব নয়। জান শ্রীলেখা, যেদিন বাড়ী থেকে সকল আপত্তি বাধা, মায়া সব দূরে ফেলে তোমার উদ্দেশ্যে এসে শুনলাম—তুমি চলে গেছ নিরুদ্দেশের পথে—সেই থেকে সুরু হয়েছে আমার দেশ বিদেশে ঘোরা তোমায় খুঁজে বার করা। এবার হয়েছে তার শেষ। কি নিয়ে শেষ হল জান? তোমার স্মৃতি।

ইতি—কাশী

সকালে উঠেই চলে এলাম ষ্টেশনে গাড়ী ধরবার উদ্দেশ্যে বাড়ী ফেরার জন্য। অনিলবাবুকে বলে এলাম হাসপাতালের বড় দিদিমণিকে চিঠিখানা পৌঁছে দিতে। অনেক দিন পরে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলাম পাটনা থেকে। চিঠি পড়ে বুঝলাম শ্রীলেখা আমার চিঠির উত্তরের বিনিময়ে শুধু দুই বিন্দু চোখের জল ফেলেছিল। তা ছাড়া তার আরত্ত কিছুই ছিল না দেবার। সে যে তার সব বিলিয়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব। আজ সে হাসপাতালের বড় দিদিমণি।

অনিলবাবুর এই চিঠির উত্তর আজও আমার দেওয়া হয় নি। দেবার সাহস নেই বলতেও আমি লজ্জিত নই। কারণ আজ আমি বিবাহ করে আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে জীবনে সুখী হতে চাই।

সমাপ্ত

—আশি—